বাংলাপিডিএফ
রাত্রির ভয়ঙ্কর
প্রতিধ্বনি
রোমেনা আফাজ
দস্যু বনহুর
২৭-২৮
দুই খন্ড একত্রে
রনি

রাত্রির ভয়ঙ্কর-২৭
প্রতিধ্বনি-২৮

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দ্রুত হস্তে লুসীকে সরিয়ে দিয়ে বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার। ভয়ঙ্কর লোকটা অট্টহাসি হেসে উঠলো, কেমন যেন উৎকট সে হাসির শব্দ।

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন খান খান হয়ে ভেংগে পড়লো সে হাসির শব্দে।

বনহুর আজ পর্যন্ত কত লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে—কত দুর্দান্ত দুর্বৃত্তের সঙ্গে, কত ভয়ঙ্কর দস্যুর সঙ্গে, কত সাংঘাতিক লম্পটের সঙ্গে কিন্তু এমন হাসি সে কোনোদিন শোনেনি। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লো!

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো বনহুর—জমকালো লোকটা তেমনি দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। রিভলভারের গুলীতে এতোটুকু টললোনা লোকটা।

বনহুর পর পর কয়েকটা গুলী ছুঁড়লো, কিন্তু আশ্চর্য—লোকটার কিছু হলো না, বরং সে যতদূতের মত এগিয়ে আসছে!

বনহুর পুনরায় গুলী ছুঁড়লো কিন্তু রিভলভারের গুলী না থাকায় কোনো শব্দ হলো না বা গুলী বেরুলো না। দুর্দান্ত দস্যু বনহুর ভীত হয়ে পড়লো—জীবনে এমন অবস্থায় সে কোনোদিন পড়েনি। লুসী তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো—বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও.....

কিন্তু কোনোদিক থেকে কোনো সাড়া আসে না। ভয়ঙ্কর লোকটা ধরে ফেলে বনহুরকে, তার লোহার সাঁড়াশীর মত হাত দু'খানা দিয়ে টিপে ধরে বনহুরের গলা।

বনহুর বলিষ্ঠ বাহু দু'টি দিয়ে নিজের গলা মুক্ত করে নিতে যায় কিন্তু সক্ষম হয় না। গলার চাপ অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

❑

যখন জ্ঞান হলো বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার চারদিকে জমাট অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। এখন সে কোথায় ভেবে পায় না। একি! হে হাত-পা কিছু নড়াতে পারছে না। বনহুর বুঝতে পারলো, তাকে মজবুত রশি দিয়ে এঁটে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সমস্ত দেহটা জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে শক্ত রশি দিয়ে। তাহলে কি সেই জমকালো লোকটা তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে? সে তা হলে এখনও তাকে ত্যাগ করেনি? মনে পড়লো দুটি

সাঁড়াশীর মত কঠিন হাতের কথা। কিন্তু লুসী কোথায়, তাকেও কি অন্ধকারে বেঁধে রাখা হয়েছে? সব যেন কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে বনহুরের। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে এখনও! গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। একটু পানির জন্য জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটখানা চাটতে লাগলো বার বার।

অনেক চেষ্টা করেও বনহুর এক চুল নড়তে পারলো না। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। লুসীর জন্য মনটা কেমন উতালা হলো। হয়তো তাকেও এই আশেপাশে তারই মত অবস্থায় রাখা হয়েছে। বনহুর ডাকলো—লুসী....লুসী.....লুসী.....

কোনো সাড়াই এলো না তার আশেপাশে থেকে।

প্রতিধ্বনি হলো শুধু তার কণ্ঠের—লুসী......লুসী.......লুসী.....

বনহুর অনেক চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হলো। না। ক্রমেই হতাশ হয়ে আসছে তার মন, এই বুঝি তার দস্যু জীবনের পরিসমাপ্তি। বনহুর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে রশিগুলো ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। অত্যন্ত মজবুত রশি—তাই ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব হলো না বনহুরের পক্ষে। না হলে তাকে রশি দিয়ে এভাবে বেঁধে রাখে কার সাধ্য! লৌহ-শিকলও তাকে কোনোদিন বন্দী করে রাখতে পারেনি। আজ বনহুর কাবু হলো রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর লোকটার কাছে।

নানাভাবে চেষ্টা করেও বনহুর তার দেহের বন্ধন এতোটুকু শিথিল করতে পারলো না।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে একটা কড় কড় শব্দ শোনা গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো, কোনো লৌহকপাট খুলে যাওয়ার শব্দ এটা। পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে আলোকরশ্মি দেখা গেলো। বনহুর পূর্বের ন্যায় জ্ঞানশূন্যের মত নিশ্চুপ পড়ে রইলো, কিন্তু সে সামান্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কক্ষমধ্যে কয়েকটা লোক প্রবেশ করলো। সম্মুখস্থ দুটি লোকের হস্তে জ্বলন্ত মশাল দপ্দপ্ করে জ্বলছে। বনহুর চমকে উঠলো, বিস্ময়ে আরষ্ট হলো সে—দেখলো মশালধারী লোক দুটির মাঝখানে মিঃ মাহমুদ রিজভী। তার পাশে সেই ভয়ঙ্কর জমকালো মানুষটি। মশালের আলোতে বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে দেখলো মাহমুদ রিজভীর পাশের কালো লোকটা এ দেশীয় মানুষ নয়। নিগ্রো বলেই মনে হলো তাকে। বিরাট দেহ, মাথাটা দেহের আকারে ছোট। মাথায় কদম-ছাটা চুল। চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় তার দেহে অসুরের শক্তি রয়েছে। সাধারণ মানুষের চেয়ে সে অনেক বেশি মোটা। মাংসপেশীগুলো যেন ফুটবলের মত

ফুলে ফুলে উঠেছে। ঠোঁট দু'খানা মোটা, সাদা মত আর উল্টানো। দেহে কোনোরকম কাপড় নেই, শুধু একটা নেংটী ধরনের কিছু আটকানো রয়েছে লজ্জাস্থানে। বনহুর আরও অবাক হলো—কালো লোকটার বুকে মজবুত লোহার পাত দিয়ে তৈরি একটি বর্ম। এবার সে বুঝতে পারলো। পর পর গুলী ছুঁড়েও কেন তাকে কাবু করতে পারেনি সে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বনহুরকে বিচলিত করলো মিঃ রিজভীর আবির্ভাব। তাকে তার মৃত্যু কূপে বন্দী করে রেখে এসেছিলো, সে জানতো ওখান থেকে বের হবার আর কোনো উপায় নেই তার। এখন দেখছে মিঃ রিজভীর তাকে কৌশলে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে। এতো দুঃখেও বনহুরের মনে হাসি পেলো। ঐ শয়তান রিজভীকেই একদিন সে অত্যন্ত ভদ্র এবং মহৎ জন বলে মনে করেছিলো।

বনহুর ঠিক্ সব দেখছিলো, কিন্তু পূর্বের মত নিশ্চুপ নিস্পন্দ-পড়ে ছিলো সে।

মিঃ রিজভী এগিয়ে এলো, ভালভাবে বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। বেশ, ওকে জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত এভাবে থাকতে দাও। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে হবে ওর শাস্তি।

মশালধারী লোক দু'টির একজন বললো—হাঁ সাহেব, সব মনে আছে। আপনি শুধু আদেশ করবেন, কাজ করবো আমরা। জব্রুই ওকে ঠিক্ করে।

কালো লোকটা গোঁ গোঁ শব্দ করে উঠলো।

বনহুর তখন চোখ বন্ধ করে পড়েছিলো, তবু অনুমানে বুঝতে পারলো, জব্রু নামটা ঐ জমকালো নিগ্রো লোকটার। এবং সে বোবা বা ঐ ধরনের কিছু হবে। বনহুর একটুও নড়ছে না, ঠিক্ যেমন পড়ে ছিলো তেমনি রয়েছে।

মিঃ মাহমুদ রিজভী কঠিন কণ্ঠে বললো—সাবধানে এর বন্ধন উন্মোচন করে লৌহশিকল পরাবে। এর আসল পরিচয় আমি পেয়েছি, জানো এ কে?

মশালধারী প্রথম ব্যক্তি বললো—সাহেব, কে এই শয়তান?

বললো-মাহমুদ রিজভী—এর পরিচয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বিশ্ব-বিখ্যাত দুর্দান্ত দস্যু বনহুরের নাম শুনেছো? সেই দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! এক সঙ্গে মশালধারী লোক দুটো যেন অস্ফুট শব্দ করে উঠলো।

রিজভী বললো—হাঁ, একে পুলিশ ফোর্স কোনোদিন বন্দী করে রাখতে পারেনি বা কেউ কোনোদিন ওকে কাবু করতে সক্ষম হয়নি। জব্রুর কৃতিত্বে আজ আমি তাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি। শোন, তোমরা অত্যন্ত হুঁশিয়ারীর সঙ্গে কাজ করবে।

আপনার আদেশ শিরোধার্য সাহেব। বললো মশালধারী একজন।

বনহুর নিস্পন্দ পড়ে ছিলো বটে কিন্তু ওদের কথাবার্তা সব শুনছিলো সে। বুঝতে পারলো, তার পরিচয় আর অজানা নেই। মাহমুদ রিজভী তাকে চিনে নিয়েছে।

রিজভী জমকালো জব্রুকে কিছু ইংগিত করলো।

জব্রু গোঁ গোঁ করে কি যেন জবাব দিলো তারপর বেরিয়ে গেলো সে। রিজভীও তাকে অনুসরণ করলো।

মশালধারী দুইজন বনহুরের পাহারায় নিযুক্ত রইলো।

বনহুর নড়ে উঠলো এবার, বললো—উঃ পানি....পানি দাও।

মশালধারী লোক দুটোর চোখ জ্বলে উঠলো চক্ চক্ করে।

প্রথম ব্যক্তি বললো—বাদ্‌লা, যা সাহেবকে খবর দে, বল্ ওর হুঁশ ফিরে এসেছে।

দ্বিতীয় জন মশালটা দেয়ালের খুপড়ীতে গুঁজে রেখে চলে গেলো।

বনহুর আবার বললো—ভাই, একটু পানি দাও না।

সাহেব এলেই তোমাকে পানি দেওয়া হবে, বুঝলে?

লোকটার কথা বলার ভঙ্গী দেখে রাগে গস্ গস করে উঠলো বনহুরের দেহ। মনে হলো এই মুহূর্তে ওকে এক ঘুষিতে শেষ করে দেয়। কিন্তু এখন সে নির্জীব হয়ে পড়েছে, কৌশলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো, পানি তো দূরের কথা, শয়তান রিজভী এসে তাকে ঘোল খাওয়াবে, মানে তার উপর চালাবে অত্যাচার। বনহুর সেজন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো। বন্দী যখন সে হয়েছে, তখন আর ভেবে কোনো ফল হবে ন।

অল্পক্ষণ পর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো মাহমুদ রিজভী আর দ্বিতীয় মশালধারী।

বনহুরকে সজ্ঞান অবস্থায় দেখে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমাকে মৃত্যুকূপে বন্দী করে বাঁচবে ভেবে পালিয়েছিলে, এবার দেখো কে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

বনহুরকে একটি লোহার খাটিয়ার সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। খাটিয়াটা পাথরের মেঝের সঙ্গে কঠিনভাবে আটকানো। বনহুর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো, রিজভীর মুখে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—দস্যু বনহুর মৃত্যুভয়ে কাতর নয় রিজভী।

দেখা যাবে কাতর হও কিনা। ভেবেছো দস্যু বনহুর নাম শুনলে চমকে উঠবো?

বনহুর বললো—তোমার মুখেই আমি জানতে পেয়েছি, আমি নাকি দস্যু বনহুর।

আমার মুখে?
হাঁ, তুমি যখন আমার পরিচয় এদের কাছে দিচ্ছিলে তখন......
ও, তুমি তাহলে অজ্ঞান হওনি?
দস্যু বনহুর এতো সহজে অজ্ঞান হয় না।
আচ্ছা এবার দেখা যাবে। প্রথম মশালধারীর দিকে তাকিয়ে বললো— ভূজঙ্গ, জব্রুকে ডাকো।
আচ্ছা সাহেব। বেরিয়ে গেলো ভূজঙ্গ।
বনহুর কঠিন একটা শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। জানে সে— কতবড় ভয়ঙ্কর লোক ঐ নিগ্রো জব্রু।
একটু পরে ফিরে এলো ভূজঙ্গ, তার পিছনে গরিলার মত ঘৎ ঘৎ করে এগিয়ে আসছে জমকালো জব্রু।
রিজভী ইংগিত করলো জব্রুকে।
জব্রু রিজভীর ইশারায় ওপাশ থেকে একটা চাবুক তুলে নিলো হাতে। জানোয়ারের মত একটা শব্দ করে হেসে উঠলো—যেমন করে হেসেছিলো জব্রু ঐ রাতে।
বনহুর তাকালো জব্রুর ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে, তার হাত-পা-দেহ বন্ধন অবস্থায় থাকলেও চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। দাঁত দিয়ে অধর দংশন করলো সে।
রিজভী এবার হাত দিয়ে ইশারা করলো জব্রুকে।
অমনি জব্রু হিংস্র হয়ে উঠলো ভীষণভাবে, আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো সে বনহুরের দেহে। যখন জব্রু বনহুরের দেহে আঘাত করছিলো তখন জব্রুর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছিলো। হুম্‌ হুম্‌ হুয়াম্‌.....হুম্‌ হুম্‌ হুয়াম্‌
বনহুর যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে ফেলছিলো। দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরছিলো ভীষণভাবে। তবু একটু শব্দ করছিলো না।
রিজভী বললো—বাদলা, লুসীকে নিয়ে আয়, দেখুক ওর শাস্তি—মনে শান্তি পাবে।
বাদলা চলে গেলো। একটু পর ফিরে এলো লুসীকে নিয়ে।
লুসীর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। এসে দাঁড়ালো বাদলার পিছনে। বনহুরের উপর নজর পড়তেই তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো—মিঃ আলম, উঃ আপনার এই অবস্থা! মাগো.....
হাঃ হাঃ হাঃ, মুখ ভেংচে বললো রিজভী—আলম! কে তোমার মিঃ আলম? জানো ওকে?

লুসী অশ্রুভরা চোখ তুলে তাকালো রিজভীর মুখের দিকে। কোনো জবাব দিলো না।

জব্রু আবার আঘাত করলো বনহুরের শরীরে।

লুসী বসে পড়লো তার পাশে—না না ওকে মেরো না। ওকে মেরো না, ওর কোনো দোষ নেই।

আবার হেসে উঠলো রিজভী—জানো ও কে? ওর পরিচয় জানলে শিউরে উঠবে সুন্দরী!

লুসীর মনে ভেসে উঠে সেদিনের কথা, বলেছিলেন মিঃ আলম—লুসী, আমার পরিচয় তুমি জানো না, আমি মিঃ আলম নই। লুসী প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে সেদিন তাকিয়েছিলো, কিন্তু মিঃ আলম বলেছিলেন, আজ নয় আর একদিন বললো। আজ রিজভীর কথায় লুসী অবাক হয়ে তাকালো।

বললো রিজভী—লুসী, তুমি ওকে বিশ্বাস করেছিলে কিন্তু ও তোমাকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিলো। বিখ্যাত দস্যু বনহুর ওর নাম।

লুসী পত্রিকায় অনেকদিন আগে পড়েছিলো এই দস্যুনাম। পড়েছিলো এ দস্যু সম্বন্ধে অনেক কথা—আজ সেই দস্যু বনহুর তার সম্মুখের মিঃ আলম! লুসী অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের ঘর্মাক্ত মুখখানার দিকে।

বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই লুসীর অন্তর মায়ায় আদ্র হয়ে উঠলো। করুণ চোখে তাকালো, দস্যুনাম শোনায় তার মনে কোনোরকম ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা এলো না। বরং ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

রিজভী জব্রুকে পুনরায় ইংগিৎ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জব্রু চাবুকের পর চাবুক দিয়ে আঘাত করে চললো বনহুরের দেহে।

লুসী ছুটে এসে নিজের দেহ এগিয়ে দিলো—আমাকে মারো তবু ওকে মুক্ত করে দাও......

লুসী বনহুরের দেহের উপর নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করতেই, রিজভী হাত দিয়ে থামিয়ে দিলো জব্রুকে।

জব্রু হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

রিজভী এক ঝটকায় লুসীকে টেনে তুলে নিলো, কঠিন কণ্ঠে বললো—লুসী, তোমার ক্ষমতা নেই দস্যুকে তুমি বাঁচাও। ওকে আমি হত্যা করবো। ধীরেনচরণকে ও হত্যা করেছে, তার প্রতিশোধ নেবো।

বনহুরের দিকে তাকিয়ে লুসী আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো। তার দেহের জামা ছিঁড়ে গেছে, চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁটের এক পাশেও কেটে গেছে অনেকটা। লুসী বলে উঠলো—মিঃ রিজভী, আপনি যা চান তাই দেবো, ওকে মুক্ত করে দিন।

বললো রিজভী—মুক্তি ও পাবে না কোনোদিন—তবে ওকে আমি মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারি যদি তুমি আমার কণ্ঠে মালা দাও—আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করো।

লুসী দৃষ্টি নত করে নিলো, তারপর ফিরে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুরের ব্যথা-করুণ চেহারা লুসীর অন্তরে দারুণ আঘাত করলো! মিঃ আলম কতবার তাকে বাঁচিয়েছেন, কতবার তাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করেছেন—আর ওকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এটুকু পারবে না! নিজেকে না হয় উৎসর্গ করে দেবো মিঃ আলমের জন্য। বললো লুসী—আমি রাজী আছি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—লুসী!

না, না, আমি আপনার জন্য সব হাসিমুখে মেনে নিতে পারবো। তবু ওরা আপনাকে মুক্ত করে দিক।

লুসী, আমার জন্য তুমি নিজেকে বিনষ্ট করো না। আমার অভিশপ্ত জীবনকে এভাবে শেষ হতে দাও লুসী।

না না, ওকে মুক্ত করে দিন রিজভী, আমি আর ওর এ কষ্ট সইতে পারছি না। আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

রিজভীর মুখ উজ্জ্বল হলো, জব্রুকে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করলো সে।

জব্রু হাতের চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘৎ ঘৎ করতে করতে বেরিয়ে গেলো। রিজভীর আদেশে সে ক্ষান্ত হলো, কিন্তু আরও মারার জন্য সে উৎগ্রীব হয়ে উঠেছিলো।

জব্রু নিগ্রো এবং বোবা। তার রাগ অতি ভয়ঙ্কর। রিজভী এই জব্রুর সাহায্যে দিল্লী শহরে বহু অসাধ্য কাজ সাধন করে থাকে। জব্রু জানোয়ারের মতই বুদ্ধিহীন, ওকে রিজভী যেভাবে চালনা করে সেভাবে সে চলে।

রিজভীর বাবা জব্রুকে ভিয়েৎকং-এর কোনো এক জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে এনেছিলো। তখন জব্রু ছিলো পাঁচ ছ' বছরের বালক মাত্র। কথা বলতে পারতো না বলেই জব্রুর বাবা-মা ওকে বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছিলো। জব্রু বনে ফলমূল খেয়েই বেঁচে ছিলো বোধ হয়। রিজভীর বাবা লোকজন নিয়ে ভিয়েৎকং-গিয়েছিলেন কোনো কাজে। হঠাৎ কোনো কাজবশতঃ তাদের বনে যাওয়ার দরকার পড়ে, তখন পায় ছোট্ট জমকালো গরিলা শিশুর মত জব্রুকে। নিয়ে আসে এবং তাকে লালন-পালন করে। কিন্তু জব্রু সভ্য জগতে এলেও আর মানুষ হতে পারলো না। বোবা তো সে জন্ম-থেকেই ছিলো, তার হাবভাব সব যেন কেমন হলো। রাক্ষসের মত খেতো, আর ঘুমাতো। একদিন এক দারওয়ানের বিছানার পাশে শুয়ে ঘোৎ

ঘোৎ করে ঘুমাচ্ছে জব্রু। দারওয়ান এসে ওকে লাথি দেয়—বেটা আমার ঘরে কেন, ভাগ এখানে থেকে।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে যাওয়ায় জব্রু বন্যহস্তীর মত তেড়ে উঠে এবং দারওয়ানজীকে টুটি টিপে হত্যা করে ফেলে।

সেদিন রিজভীর আত্মীয়-স্বজন—বাড়ির সবাই জব্রুর কাজ দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। কারো মুখে কোনো কথা ছিলো না। সবাই জব্রুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু রিজভীর বাবা জব্রুকে পিঠ চাপড়ে তাকে বাহবা দিয়েছিলেন।

সেই জব্রু আজ রিজভীর দক্ষিণ হস্তে।

জব্রুর দ্বারা সে যে-কোনো অসম্ভব কাজ সমাধা করে! শুধু মাত্র একটি ইংগিতে।

জব্রু বেরিয়ে গেলো।

রিজভী লুসীর হাতের বন্ধন মুক্ত করে দিলো, বললো—আমাদের বিয়ের পর ওর বন্ধন উন্মোচন করা হবে।

চলো এ কক্ষ থেকে। লুসীর হাত ধরে রিজভী বেরিয়ে গেলো।

লুসী করুণ অশ্রুভরা নয়নে বার বার তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর নিশ্চুপ পড়ে রইলো, দেহের আঘাতের চেয়ে তার মনে বেশি দুঃখ লুসীর জন্য! একটা লম্পট প্রৌঢ়কে বিয়ে করে লুসীর জীবন বিনষ্ট হবে! পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। এ মুহূর্তে এক ফোঁটা পানি পেলে সে আবার নবজীবন লাভ করতো।

মশালধারী বাদলা আর ভূজঙ্গ বেরিয়ে গেলো মশাল হস্তে। কড় কড় শব্দে বন্ধ হলো আবার লৌহকপাট। জমাট অন্ধকারে ভরে উঠলো কক্ষটা।

❑

ঘুমন্ত নূর হঠাৎ জেগে উঠলো একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। বিছানায় বসে ডাকলো—মা, মা, বাপি এসেছে, ঐ দেখো বাপির সমস্ত শরীরে রক্ত.....

ধড়মড় করে উঠে বসে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকায় মনিরা কক্ষের চারদিকে—কোথায় বাবা তোমার বাপি? কোথায় সে?

মাগো, ঐ তো বাপিকে তুমি দেখতে পাছো না?

মনিরা মনে করে—সত্যি বুঝি সে ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে দাঁড়ায়। সুইচ টিপে আলো জ্বালে—কই, কোথায় নূর, তোর বাপি কোথায়? মনিরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—আর কি সে ফিরে আসবে নূর! আর কি আমি তাকে পাবো বাপ?

মা, আমি কি তবে স্বপ্ন দেখলাম? ছোট নূর খাট থেকে নেমে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়।

মনিরা পুত্রকে বুকে চেপে ধরে—বাবা, কি স্বপ্ন দেখলি তুই?

মা, সেকি তোমায় বলবো। আমি বাপিকে ঠিক দেখেছি। বাপি ঐ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। তার সমস্ত দেহে রক্তের ধারা বইছে। মা, সত্যি বাপির কিছু হয়েছে।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকেন মরিয়ম বেগম—মা মনিরা, কি হয়েছে মা? দরজা খোল.....দরজা খোল......

মনিরা দরজা খুলে দেয়।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করেন— আমার মনির এসেছে? ওরে আমার মনির এসেছে? কোথায়? কোথায় আমার মনির?

মনিরা আঁচলে চোখের পানি মুছে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— মামীমা, নূর স্বপ্ন দেখেছে, তার বাপি নাকি এসেছে।

তাহলে আমার মনির আসেনি? ফিরে আসেনি সে? ওরে নূর, কি দেখলি, কেমন দেখলি তোর বাপিকে? মরিয়ম বেগম নূরকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেন।

নূর স্বপ্নে যা দেখেছিলো বলে।

নূরের কথায় মরিয়ম বেগম কেঁদে আকুল হন, পুত্রের সন্ধান তিনি অনেকদিন হলো পান না, না জানি সে জীবিত আছে না মরে গেছে। হয়তো বা কোথায় কিভাবে আছে কে জানে! মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠে।

সমস্ত রাত আর ঘুম হয় না কারো।

শুধু আজ নয়, এমনি কত দিন, কত রাত এই চৌধুরী বাড়িতে শোকের হাওয়া বয়ে গেছে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব এখন আরও বৃদ্ধ হয়েছেন। তারও কি কম চিন্তা—চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার জীবন।

মরিয়ম বেগম পুত্রশোকে কাতর।

মনিরার অবস্থাও তাই। মেয়েদের স্বামীই তো সব—হোক সে চোর-ডাকু বা খুনী-আসামী তবু স্বামী। মনিরা স্বামীর অভাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে। কোনো সময় তার মুখে হাসি নেই। যেন ধীরস্থির একটি প্রতিমূর্তি। যা না করলে নয়, তাই সে করে। নূরের জন্য একটু নড়তে হয়, নইলে তো একেবারে স্থবিরের মত হয়ে পড়তো।

মরিয়ম বেগম শুধু নামায আর কোরআন তেলাওয়াৎ নিয়ে কাটান, সব সময় তার কামনা শুধু পুত্রের জন্য। পুত্রের চিন্তায় তিনি সর্বক্ষণ বিভোর। মাঝে মাঝে সংসার দেখা-শোনা তাকে করতে হয়; কিন্তু মন তার পড়ে থাকে কোথায়—কোন্ অজানা দেশে।

নূর স্কুলে পড়ে, আজকাল একটু-আধটু বুঝতে শিখেছে। মাঝে মাঝে কখনও বাপির কথা স্মরণ হল উদাস হয়ে পড়ে। পড়া শোনায় সে সেরা ছেলে, যদিও তার বয়স সামান্য তবু বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। বাপির কথা মনে হলে মাকে গিয়ে প্রশ্ন করে—মাগো, আমার বাপি কোথায় গেছে? কবে আসবে? কেন সে এত দিন আসে না?

কিন্তু কি জবাব দেবে মনিরা, কি করে বলবে তার বাপি কোথায় গেছে! কবে আসবে তাই বা কে জানে! জীবিত আছে না নেই, তাই বা কে বলতে পারে!

মনিরা শিশু সন্তানের কথায় শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতো, স্বামীর মুখখানা বার বার স্মরণ হতো তার অন্তরে।

মাকে কাঁদতে দেখে নূর ব্যস্ত হয়ে পড়তো, মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলতো—মা, বাপির কথা বললে তুমি কাঁদো কেন? আর আমি বাপির কথা বলবো না। ছোট্ট নূর এখন অনেক কথা বলতে শিখেছে।

নূরের কথায় মনিরা ওকে বুকে চেপে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো—আমি এমনি কাঁদছি বাবা। তোমার বাপির কথা মনে করে কাঁদছি? তুমি কেন বলবে না?

মাগো, আমার বাপি কি করে বলো না মা? কোথায় থাকে সে?

তোমার বাপি মস্ত সৈনিক, দেশের কাজ তিনি করেন বাবা। কখন যে কোথায় থাকেন আমরা কেউ জানি না।

এবার বাপি এলে আমি কিছুতেই তাকে আর যেতে দেবো না। কিছুতেই যেতে দেবো না।

হায়রে অবুঝ শিশু, সে জানে না তার বাপিকে এ পৃথিবীর কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কোনো শক্তিই তার চলার পথে বাধা দিতে পারবে না।

মনিরা নীরবে পুত্রের কথা শুনে যেতো আর আঁচলে চোখের পানি মুছতো।

মনিরা সদা উদাসীন থাকে বলে মামী-মার চিন্তার অভাব নেই। সরকার সাহেবও ভাবেন এ ব্যাপার নিয়ে। মনিরার বয়স তো খুব বেশি নয়, এই বয়সে কোন্ মেয়ে স্বামী ছাড়া বাঁচতে পারে!

মাঝে মাঝে রহমান আসে, গোপনে সাক্ষাৎ করে যায় সে মনিরার সঙ্গে। সর্দার না থাকায় তাদের মনের অবস্থা ভাল নয়। সমস্ত আস্তানা জুড়ে এক মহা অশান্তির কালোছায়া নেমে এসেছে। তবে আস্তানার কাজ বন্ধ নেই, তাদের দলবল সব পূর্বের ন্যায় সঙ্গবদ্ধভাবেই রয়েছে। রহমান এখন এদের পরিচালনা করে। কায়েস তার সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

নাসরিন তার কয়েকজন সঙ্গিনী মেয়েদের নিয়ে বনে বনে নেচে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। বৃদ্ধা দাইমার অনুরোধে নাসরিনকে বিয়ে করেছে রহমান। অবশ্য বনহুর রহমানকে আদেশ দিয়েছিলো নাসরিনকে যেন রহমান জীবনসঙ্গিনী করে নেয়।

রহমানকে স্বামীরূপে পেয়ে নাসরিন গর্বিতা-আনন্দিতা, রহমান বলিষ্ঠ সুন্দর সুপুরুষ। তাছাড়া দস্যু বনহুরের সহকারী সে—কম কথা নয়।

তাজকে নিয়ে শুধু মুস্কিলে পড়েছে রহমান। তাজ সেই থেকে কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। ভালভাবে খায় না, সব সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, হয়তো তার মনিবকে আর দেখতে পায় না—এটাই তার দুঃখ।

রহমান নিজের হাতে তাজকে খাওয়ায়। পিঠ চাপড়ে আদর করে। গা নেড়ে দেয়।

অশ্ব হলেও তাজ অত্যন্ত বুদ্ধিশীল ছিলো।

মাঝে মাঝে তাজকে নিয়ে যেতো রহমান কান্দাই শহরে। চৌধুরী বাগান বাড়ির অদূরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকতো। মনিরা স্বামীর অশ্বের পাশে এসে দাঁড়াতো। তাজের পিঠে স্বামীর চেহারাটাই ফুটে উঠতো তার চোখের সামনে। জমকালো তাজের পিঠে জমকালো পোশাক পরা সৌম্য সুন্দর একটি পুরুষ।

মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। রহমান সান্ত্বনা দিতো, বলতো—বৌরাণী কাঁদবেন না। সর্দার নিশ্চয়ই ভাল আছেন। তিনি আবার ফিরে আসবেন।

কিন্তু মনিরার মনে সান্ত্বনা আসতো না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতো তার বুক চিরে।

রহমান ফিরে যেতো।

তাজ অদৃশ্য হতো দৃষ্টির অন্তরালে। মনিরা ঘরে ফিরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়তো বিছানায়, শূন্যতায় হাহাকার করে উঠতো তার মন।

নূর তখন স্কুলে।

মামীমা হয়তো ঘরে বসে এবাদত করছেন। মনিরা একা একা, স্বামীর শিশুকালের ছবিটা বুকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতো নিশ্চুপ পাষাণমূর্তির মত।

পাশের বাড়ির এক বান্ধবী ছিলো মনিরার। কলেজে একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছে ওরা। অল্পদিন হলো বিয়ে হয়ে এসেছে, চৌধুরী বাড়ির অদূরেই তাদের বাড়ি। মনিরার বান্ধবীর নাম মাসুমা। মনিরার সঙ্গে ওর অত্যন্ত মিল ছিলো ছোটবেলা থেকেই—স্কুলে যখন পড়তো তখন হতে। তারপর কলেজ জীবনেও ওরা পড়াশোনা করেছে এক সঙ্গে।

এবার মাসুমা বিয়ে হয়ে এলো মনিরার বাড়ির পাশে। সময়ে অসময়ে মাসুমা আসতো মনিরার কাছে। মনিরা সন্তানের জননী হয়েছে, আর মাসুমা সদ্য বিবাহিতা।

মনিরার হৃদয়জোড়া হাহাকার আর মাসুমার জীবন আনন্দে ভরপুর।

মাসুমা স্বামীর কথা নিয়ে মেতে উঠতো—কত কথা!

মনিরা নিশ্চুপ শুনে যেতো, সামান্য দু'চারটে কথা বলতো। উদাস হয়ে পড়তো মনিরা, মাসুমার স্বামীর কথায় মনে হতো তার স্বামীকে।

বলতো মাসুমা—আমি তো তোকে সব কথাই বলি। কোনো কথা লুকোই না, কিন্তু তুই বড্ড চাপা মেয়ে—একটি কথাও তুই বলিস না আমাকে।

মনিরা হাসতো—ব্যথাকরুণ, বেদনাভরা সে হাসি।

মাসুমা নাছোড়বান্দা, একদিন মনিরাকে ধরে বসলো সে—শুনেছি তোর স্বামী নাকি দূরদেশে কাজ করেন, কিন্তু কি করেন তা তো কোনোদিন বললি না?

মনিরা বিব্রত বোধ করে, যদিও তার মিথ্যা বলা অভ্যাস নয় তবু মাসুমার কাছে তাকে মিথ্যা কথাই বলতে হয়েছিলো। মাসুমা বলেছিলো—হাঁ ভাই, তোর স্বামী কি করেন?

জবাব দিয়েছিলো মনিরা—বিদেশে থাকেন। চাকরী করেন।

মাসুমা আজ ধরে বসলো —তোর স্বামী কি চাকরী করেন তা তো বললি না মনিরা! আজ তোর সব কথা বলতে হবে।

মাসুমার কাছে মনিরা অন্তরের কথা বলে, কিন্তু তাই বলে সব কথাইতো বলা চলে না বা যায় না! হেসে বললো মনিরা—তিনি সেনা বিভাগে কাজ করেন। সেনাপতি।

মাসুমার মুখে হাসি ফুটেছিলো পরক্ষণেই মুখ গম্ভীর করে বলেছিলো—তাই তো এমন বৌ ঘরে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছেন, নইলে সারাদিন তোর আঁচলের তলায় পড়ে থাকতেন, বুঝলি?

একটা নিশ্বাস গোপনে চেপে বলেছিলো—মনিরা আঁচলের নীচে থাকবার মানুষ সে নয় মাসুমা, সে যে পাষাণের চেয়েও কঠিন।

বুঝেছি অভিমান হয়েছে। একবার দেখা হলে আমি তাকে ঠিক্ করে দেবো মনিরা। কেমন করে তোকে ছেড়ে পালায় দেখবো! জানিস ভাই, আমার স্বামী একটি মুহূর্ত আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নয়। অফিসে যান তাই না কতো, যতক্ষণ অফিসে থাকেন ফোনের পর ফোন করেন। সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার কেমন লাগে। বাড়িতে শ্বশুড়-শাশুড়ী কি যে ভাবেন---

মনিরা মাসুমার কথা শোনে আর ভাবে তার নিজের স্বামীর কথা সেও তো অমনি, একদণ্ড তাকে ছেড়ে সরে যেতে চায় না, কিন্তু পারেনা সে থাকতে। তার কাজ, তার নেশায় তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন কোনো শক্তিই তাকে ধরে রাখতে পারে না। মনিরা জানে তার স্বামীর ভালবাসা অপূর্ব, যার কোনো দাম নেই। তার স্বামীর মত এমন ভালবাসতে বুঝি আর কেউ জানে না।

মনিরা স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে যেতো।

মাসুমা বলতো—একি, এমন নিশ্চুপ হয়ে গেলি কেনো মনিরা?

জাবাব দিতো—কিছু না।

হাঁরে মনিরা, শুনেছি তোর স্বামী নাকি খুব সুন্দর দেখতে?

মোটেই না, কুৎসিৎ কদাকার তিনি।

বড্ড দুষ্ট তুই নিজের স্বামীর কথা বলবি না, এইতো?

এমনি নানা কথাবার্তায় দুই বান্ধবী মেতে উঠতো। মনিরার ভাল লাগতো মাসুমাকে, মাসুমা ভালবাসতো মনিরাকে। মনিরা সব কথা বান্ধবীকে বললেও আসল কথা কোনোদিন বলতো না, কারণ মাসুমার স্বামী পুলিশ অফিসার—পুলিশ সুপার সে। তরুণ পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী।

কান্দাই শহরে ছুটিতে হাশেম এসেছে নতুন বৌকে নিয়ে বাপ-মার কাছে ক'টা দিন কাটাবে বলে। তারপর চলে যাবে সুদূর ভারতে। এর আগে ছিলো হাশেম চৌধুরী রেঙ্গুনে, সেখান থেকে বদলী হয়েছে সুদূর ভারতে। ইচ্ছা করেই হাশেম চৌধুরী ভারতে যাওয়া স্থির করে নিয়েছে। দিল্লী নগরীতে তার জয়েনের হুকুম এসেছে।

মাসুমার আনন্দ ধরে না—সে ভারতবর্ষ দেখতে পাবে! বিশেষ করে দিল্লী দেখার সখ তার অনেক। দিল্লীর বাদশাহদের জীবনকাহিনী তাকে চঞ্চল করে তোলে। আকবরের সমাধি, মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল, দিল্লীর চেরাগে দেহেলি, মাজার—আরও কত কি!

মাসুমা গল্প করে —মনিরা তন্ময় হয়ে শুনে। এসব দেশ দেখার সখ তারই কি কম! কিন্তু উপায় নেই, কি করে যাবে, কে তাকে নিয়ে যাবে এই সব দেশে।

❑

ছুটির দিন শেষ হয়ে আসে হাশেম চৌধুরীর।

মাসুমা বলে—ভাই, তোকে ছেড়ে যেতে হবে তাই আমার দুঃখ। সত্যি, তোকে যদি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম!

হাসে মনিরা—সে সৌভাগ্য আমার কোনো দিন হবে না মাসু। আমি বড় হতভাগী।

কিসের অভাব তোর? লক্ষ লক্ষ টাকা যাদের রয়েছে তাদের আবার অভাব! ইচ্ছা করলে তুই সব পারিস।

কি যে বলিস ভাই। টাকা থাকলেই সব হয় না। তোর স্বামী পাশে আছে, তাই এতো বড় বড় কথা বলতে পারিস, আমার সব থেকেও আজ আমি সর্বহারা! জানিস মাসুমা, আমার বুকের মধ্যে কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে।

বলবি না তো কোনো কথা, জানবো কি করে!

সবতো বলবার নয়, তাই বলতে পারি না মাসু।

লক্ষ্মী বোনটি আমার, সত্যি তোর জন্য আমার অনেক কষ্ট হয়। আমার স্বামী যখন পাশে আসে—হাসে, কথা বলে, তখন মনে পড়ে তোর কথা জানিস মনিরা, তোর কথা মনে হলে আমি কেমন বিমর্ষ হয়ে যাই। উনি বলেন, হঠাৎ গম্ভীর হলে কেন? আমি কোনো জবাব দেই না। মনিরা, তুই যদি বলিস তাহলে আমি ওকে বলবো তোর সব কথা। কে তোর স্বামী যে এমন মানুষ বছরে একটি বার স্ত্রীর কথা মনে করে না। বড় পাষাণ, বড় নির্দয় তোর স্বামী।

মনিরা মাসুমার মুখে হাত চাপা দেয়, না না, তার কোনো দোষ নেই মাসু। সে তো সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই আসতে পারে না।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে মাসুমা—অমন চাকরী নাই বা করলো। কিসের অভাব তার? টাকার? কেন তোর তো অগাধ ঐশ্বর্য, যত টাকা সে চায় দিতে পারিস না?

উদাস কণ্ঠে বলে মনিরা—টাকার অভাব তার নেই মাসু। আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে তার অনেক অনেক বেশি ঐশ্বর্য আছে।

তবে কেন সে চাকরী করে?

তার নেশা।

তোর মত স্ত্রীকে অবহেলা করে সে নেশা বজায় রাখে! বুঝেছি।

কি বুঝলি?

তোদের মধ্যে বনিবনাও নেই বুঝি?

ছিঃ ভুল বুঝিস নে মাসু। ওর মত মানুষ হয় না রে! ওর ভালবাসা যে একবার পেয়েছে সে ওকে কোন দিন ভুলতে পারবে না। মাসু, তোকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, সে কেমন। মনিরার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে আসে।

মাসুমা বলতো—বেশ, তোর স্বামীর মত আর কারও স্বামী হয় না। কাঁদিস্‌নে বোন। নিজের হাতে মাসুমা মুছে দিতো ওর চোখ দুটো। ভাবতো—স্বামীকে কত ভালবাসে মনিরা, স্বামীর কথায় সে আত্মহারা হয়ে যায়!

একদিন কথায় কথায় বলেছিলো মাসুমা—মনিরা, চল্‌না আমার সঙ্গে একবার ভারতবর্ষ দেখে আসি।

তা কেমন করে হয় ভাই! মামীমা বুড়ো মানুষ —কখন কেমন থাকেন। তাছাড়া নূরের পড়াশোনা---

বলেছিলো মাসুমা—আমি মামীমাকে বলে সব ঠিক্ করে নেবো। আমার সঙ্গে থাকবি, চলে আসবি কয়েক মাস পরে।

সম্ভব নয় মাসু।

মাসুমা তবু বলেছিলো মরিয়ম বেগমকে—মামীমা, মনিরাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ভারতবর্ষে যাচ্ছি—দুই বান্ধবী মিলে খুব করে ঘুরে বেড়াবো। আপনি অনুমতি দিলে খুব ভাল হয়।

মামীমা কিছু বলবার আগেই মনিরা বলে উঠে—তা হয় না, এদিকে কে সামলাবে সব বল্ দেখি। মামীমা বুড়ো মানুষ!

মরিয়ম বেগম মাসুমার কথায় খুশি হন, মনিরা দিন-রাত স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে, সব সময় কাঁদাকাটা করে। কচি বয়সে একদম যেন বুড়িয়ে গেছে সে। মরিয়ম বেগম বললেন—মাসুমা, ভাল কথাই বলেছে মা, যাওনা একবার ভারতবর্ষটা দেখে এসো। আমার কত সখ ছিলো ভারতে একটা বাড়ি করবো; কিন্তু হয়ে উঠেনি। বাংলা দেশের মানুষ আমরা অথচ বাংলাদেশ থেকে কত দূরে আজ রয়ে গেছি।

মামীমা, তোমার এই রোগ-জিরজিরে শরীর, তাছাড়া নূরের পড়াশোনা রয়েছে---

আমার শরীর আবার কবে ভাল থাকে মা, এই শরীর নিয়েই বেঁচে থাকবো। মরণ নেই আমার, নইলে এতো দুঃখ-বেদনা সইবে কে? নূর আমার কাছেই থাকবে, সরকার সাহেব আছেন। নূরকে দেখাশোনা করবার লোকের অভাব হবে না। যাও মা, মাসুমা যখন এতো করে ধরেছে তখন যাও ভারতবর্ষটা একবার ঘুরে এসো।

মামীমার কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না মনিরা, নিশ্চুপ রয়ে যায় সে।

মাসুমার আনন্দ আর ধরে না, মনিরা যাবে তার সঙ্গে—এযে কত বড় আনন্দের কথা! স্বামীকে বলে রাজী করিয়ে নেয় মাসুমা—ওগো, মনিরাকে নিয়ে যাবো সঙ্গে, খুব মজা হবে, তাই না?

তার স্বামী কি ভাববেন বলো তো?

স্বামী তোর আর এখন এখানে নেই। মামীমাই তার অভিভাবক। স্বামী বছরে আসনে না, কেমন লোক বলো তো? অমন লক্ষ্মী মেয়েকে এতো অবহেলা! মনিরাকে দূরে নিয়ে গিয়ে ওর স্বামীকে খুব করে জব্দ করবো। দেখবো তখন বৌ-এর কথা মনে পড়ে কি না!

❑

এলোমেলো চুল, বিক্ষিপ্ত বসন, সমস্ত দেহ ঘেমে নেয়ে উঠেছে। আঁচলখানা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ হস্তে জ্বলন্ত মশাল, কক্ষে প্রবেশ করে লুসী। ঠিক্ যেন পাগলীর ন্যায় তাকে দেখাচ্ছে।

বনহুর এতো কষ্টেও জ্ঞান হারায় নি, সে ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হলো লুসীর চেহারা দেখে।

খুসী বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো, চাপা কণ্ঠে বললো—মিঃ আলম!

লুসী। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর।

লুসী হস্তস্থিত মশালের আগুনে বনহুরের বন্ধন অগ্নিদগ্ধ করে চললো। অল্পক্ষণে বনহুরের শরীরের মজবুত রশি খসে পড়লো।

বনহুর নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই উঠে দাঁড়ালো, নিজের ক্ষত-বিক্ষত দেহের দিকে না তাকিয়েই লুসীকে জাপ্‌টে ধরলো—লুসী, তোমার এ অবস্থা কেন?

লুসী বাষ্পরুদ্ধ ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বলে উঠলো —আমার সব শেষ হয়ে গেছে মিঃ আলম-----আমার সব শেষ হয়ে গেছে---

লুসী!

আপনাকে বাঁচাবার জন্য আমি নিজেকে বিসর্জন দিয়েছি।

লুসী, আমার জন্য কেন তুমি নিজের সর্বনাশ করলে? কেন, কেন তুমি নিজেকে এমন করে বিনষ্ট করলে লুসী!

আর নয় মিঃ আলম, আপনি এ মুহূর্তে পালিয়ে যান।

আর তুমি?

কি হবে আর আমার ফিরে যেয়ে। মিঃ আলম, আমি আর ফিরে যাবো না।

এ তুমি কি বলছো লুসী?

হাঁ, মৃত্যুই এখন আমার কামনা।

তা হয় না লুসী, মরতে আমি তোমাকে দেবো না।

এ নিকৃষ্ট অপবিত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ হবে! পারবো না এ দুর্বিসহ জীবন নিয়ে বাঁচতে। যান, যান আপনি---

কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না লুসী।

আপনার পায়ে পড়ি আপনি চলে যান, জানেন না ঐ শয়তানা মাহমুদ রিজভী কতবড় ভয়ঙ্কর!

লুসী, দস্যু বনহুর কোনো দিন ভয়ঙ্করকে ভয় করে না। এখন আমি মুক্ত—দেখে নেবো মাহমুদ রিজভীর দেহে কত শক্তি। আর তার সেই নিগ্রোটারই কত বুদ্ধি-কৌশল। কৌশলে সে আমাকে ঐ রাতে কাবু করে ছিলো, আমি জানতাম না তার কালো দেহে লৌহ্ বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলো। বনহুর লুসীর হাত মুঠায় চেপে ধরে—লুসী তুমিও চলো আমার সঙ্গে?

এ পাপময় জীবন নিয়ে--

কেউ তোমাকে গ্রহণ না করুন, তুমি থাকবে আমার পাশে।

আমার বোন নেই, তোমাকে আমি বোনের আসনে প্রতিষ্ঠা করবো লুসী।

মশালের আলোতে বনহুর দেখলো লুসীর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আবেগ ভরা গলায় বললো বনহুর—দস্যুর বোন হতে আপত্তি নেই তো?

দাদা, আপনি দস্যু কিন্তু আমার প্রাণদাতা আপনি। লুসী বনহুরের পায়ে প্রণাম করলো।

বনহুর বললো—আর বিলম্ব নয় লুসী, চলো তাহলে।

চলুন। শয়তান মাহমুদ রিজভী এখন নেশায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার অনুচরগণ সবাই এখন ওদিকে শরাব পান নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছে। জব্রু এক ড্রাম নেশা ভক্ষণ করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। চলুন, এ মুহূর্তে সরে পড়তে হবে।

বনহুর বললো—চলো বোন।

লুসী হাত থেকে মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বনহুর লুসীর হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। অন্ধকার কক্ষের লৌহদরজা পেরিয়ে বাইরে আসতেই বনহুর লক্ষ্য করলো কক্ষটা গভীর মাটির নীচে, কক্ষের মুখ একটা সুড়ঙ্গ পথের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। আর একটা পথ সোজা চলে গেছে নীচের দিকে।

বনহুর কোন্ পথে অগ্রসর হবে ভাবছে।

লুসী বললো—দাদা, এই যে পথ দেখছেন এটা দিয়েই শয়তান মাহমুদ রিজভী আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। ওটা চলে গেছে রিজভীর আস্তানার দিকে। আর এ পথটা আমি জানিনা কোথায় গেছে।

জমাট অন্ধকার হলেও ঝাপসা আকারে সুড়ঙ্গ মুখগুলো দেখা যাচ্ছিলো। তাছাড়া বনহুরের চোখে অন্ধকার স্বচ্ছই লাগে, কারণ এসব তার অভ্যাস আছে।

বনহুর লুসীসহ দ্রুত দ্বিতীয় সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হলো।
চলেছে তো চলেছেই। সে পথের যেন শেষ নেই।
অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। বনহুরের হাতের মুঠায় লুসীর হাত—পাশাপাশি এগুচ্ছে ওরা।
একবার বললো বনহুর—লুসী, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?
না। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?
আমার কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস আছে লুসী।
কিছুক্ষণ নীরবে উভয়ে এগুলো, বললো বনহুর—লুসী, আমি দস্যু বনহুর জেনেও তুমি আমার সঙ্গে আসতে সাহস করলে?
জানি আপনি ঐ সব লম্পট শয়তানদের চেয়ে অনেক ভাল।
দাদা, আপনি দেবতা—মানুষ নন।
বোন, চিরদিন যেন তোমার এ বিশ্বাস অটুট থাকে।
লুসী হাঁপিয়ে পড়েছিলো, বললো—একটু জিরিয়েনি।
ঠিক্ সে মুহূর্তে পিছনে শোনা যায় অনেকগুলো লোকের কণ্ঠস্বর, সমস্ত কণ্ঠ ভেদ করে আরও একটা শব্দ ভেসে আসে সুড়ঙ্গ পথে—হুম্ হুম্ হোঃ হোঃ---
বনহুর আর লুসী চমকে উঠে।
বনহুর বলে—নিগ্রো বোবাটাও জেগে উঠেছে লুসী। এবং তারা জানতে পেরেছে আমরা পালিয়েছি। আর একটু দেরী করা ঠিক নয়, দ্রুত পা চালাও লুসী।
চলুন দাদা, ওদের হাতে ধরা পরার চেয়ে মরণ ভাল।
বনহুর আর লুসী ছুটতে শুরু করলো।
পিছনে হই-হুল্লোড় আর হট্টগোল চলেছে। বোধ হয় দ্রুত ছুটে আসছে ওরা। বনহুর পিছনে তাকিয়ে বললো—লুসী, মশালের আলো দেখতে পাচ্ছো? ওরা মশাল নিয়ে আসছে।
এখন উপায়?
আরও জোরে ছোট লুসী আরও জোরে---
বনহুর লক্ষ্য করছে, লুসী বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে।
কিন্তু কোনো উপায় নেই—লুসীকে বাঁচাতেই হবে। নিজের জন্য ভাবে না বনহুর, লুসীর জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
ক্রমেই জম্ভুর হুঙ্কার আর লোকজনের চীৎকার নিকটে মনে হয়। মশালের আলোও অনেক বেশি মনে হচ্ছে। বনহুর আর লুসী অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে দ্রুত ছুটে চলেছে।

হঠাৎ সম্মুখে বাধা পায় বনহুর আর লুসী, দেখতে পায় পথ রুদ্ধ, একটা কপাট দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

লুসী হাঁপাচ্ছে, এবার কেঁদে উঠে লুসী—দাদা এবার কি হবে?

বনহুর কোনো কথা বলে না বা বলবার সময় পায় না। প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে শুরু করে সে কপাটে।

বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে দুলে উঠে কপাটখানা। এবার সমস্ত শক্তি দিয়ে কপাটের কব্জা খুলে ফেলে মোচড় দিয়ে, তারপর কপাটখানা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে লুসীর হাত ধরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মুহূর্তে চুক্ষ স্থির হয়ে যায় বনহুর আর লুসীর।

সুড়ঙ্গমুখেই এক খরস্রোতা নদী ভীমগর্জন করে ছুটে চলেছে। সেকি প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে—সুড়ঙ্গমুখের পাথর খণ্ডের গায়ে।

লুসী বনহুরকে চেপে ধরে দু'হাত দিয়ে।

বনহুর কি করবে উপায় খোঁজে।

সম্মুখে নদীর ভীষণ জলোচ্ছ্বাস আর পিছনে ভয়ঙ্কর সেই নিগ্রো জব্রু। বনহুর বললো—লুসী, মরতে চাও না রিজভীর কাছে ফিরে যেতে চাও? বলো এক মুহূর্ত বিলম্বের সময় আর নেই।

মরতে আমি প্রস্তুত আছি দাদা, তবু রিজভীর পাশে ফিরে যাবো না।

তবে এসো নদীবক্ষে ঝাপিয়ে পড়ি, এই হয়তো তোমার আমার শেষ দেখা লুসী---

দাদা!

বোন, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না।

বনহুর লুসীর হাত ধরে ভীষণ রূপধারী নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়লো। লুসীর হাত সে কিছুতেই ছেড়ে দিলো না।

তরঙ্গবক্ষে ডুবছে আর উঠছে ওরা।

কিন্তু বেশিক্ষণ লুসীকে ধরে রাখতে পারলো না বনহুর। তার হাতের মুঠা থেকে লুসীর হাতখানা খসে গেলো প্রচণ্ড ঢেউ-এর আঘাতে।

বনহুর সাঁতার কেটে নিজেকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করে ডাকলো—লুসী--লুসী--লুসী

কিন্তু কোথায় লুসী! কোনো সাড়া এলো না।

চারদিকে জমাট অন্ধকার আর মেঘের গর্জনের মত তরঙ্গায়িত নদীর হুঙ্কার।

বনহুর সাঁতার জানে ভালো, ছোট বেলায় নূরীর আর সে নদীর বুকে সাঁতার কাটতো। দু'জনে পাল্লা দিয়ে ভেসে যেতো দূরে —অনেক দূরে।

আজ বনহুর ভয়ঙ্করী নদীবক্ষে সাঁতার কাটার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে পারলো না। ঢেউ-এর আঘাতে বার বার তলিয়ে যেতে লাগলো সে।

যতই শক্তিশালী হোক কতক্ষণ টিকতে পারে। উত্তাল তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে বনহুর তলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

❑

ফুল কলসী কাঁখে নদী তীরে এসে দাঁড়ালো। রোজ সে নদী তীরে আসে পানি নিতে। প্রতিদিনের মত ফুল আজও অবসর সময়ে নদী থেকে পানি নিতে এসেছে।

আজ সে একা আসেনি, কেশব তার সঙ্গে এসেছে। সন্ন্যাসী বাবা বলেছেন ফুল যেন একা কোথাও না যায়। কারণ এদেশে তারা নতুন এসেছে। দিল্লী নগরীর নিকটবর্তী কোনো এক জঙ্গলে আস্তানা নিয়েছে তারা।

ফুলের জন্য সন্ন্যাসী বাবার অনেক চিন্তা। যুবতী সুন্দরী মেয়ে ফুল, একা গহন বনে বা নদীর কূলে যাওয়া তার জন্য মোটেই উচিৎ নয়, কেশবকে তাই তিনি বলে দিয়েছেন সব সময় ফুলের সঙ্গে থাকতে।

আজও তাই কেশব এসেছে ফুলের সঙ্গে।

ফুল এগিয়ে গেলো নদীর দিকে।

কেশব দাঁড়িয়ে রইলো অদূরে।

হঠাৎ ফুল চীৎকার করে উঠলো—কেশব ভাইয়া, দেখো ঐ যে বালির মধ্যে একটা লোক উবু হয়ে পড়ে আছে!

কেশব তাকালো, সত্যি একটা লোক অদূরে বালির মধ্যে উবু হয়ে পড়ে আছে। ছুটে গেল কেশব, ফুলও এগিয়ে গেলো ব্যস্ত হয়ে। কেশব লোকটার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লো। বললো—কোনো নৌকা বা জাহাজডুবি লোক—আহা, বেচারা মরে গেছে!

লোকটা উবু হয়ে পড়ে থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছিলো না। শুধু পিঠটা দেখা যাচ্ছিলো। জামা ছিঁড়ে গেছে, পিঠের কিছু অংশ বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু পিঠে ক্ষতের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

বললো ফুল—আহা, লোকটাকে কেউ বা কারা চাবুক দিয়ে মেরেছে। দেখছো না কেশব ভাইয়া, ওর পিঠের চামড়াগুলো ছিঁড়ে কেটে উঠে গেছে।

হাঁ ঠিক্ বলেছো।

চলো যাই কেশব ভাইয়া?

যাবে, কিন্তু লোকটা?

মরে গেছে, কি আর হবে ওকে দেখে।

দাঁড়াও ফুল, দেখি লোকটা সত্যিই মরে গেছে না বেঁচে আছে। কেশব লোকটাকে চীৎ করে শুইয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফুল অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—হুর! তার হাতের কলসীটা পড়ে গেলো মাটিতে। ফুল লুটিয়ে পড়লো ওর বুকে—হুর, তুমি---তুমি---

কেশব বিস্ময়ে হতবাক, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কে এ লোক, ফুল ওকে চিনলো কি করে!

নদীর ঢেউ-এর আঘাতে বনহুর তলিয়ে গেলেও প্রাণপণে সাঁতার কেটে ভেসে থাকার চেষ্টা করেছিলো। এবং যতদূর সম্ভব নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঢেউ-এর বুকে দেহটা এলিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু কখন যে তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিলো সে জানে না। হয়তো খোদার ইচ্ছা, তাই বালুচরে আটকা পড়ে গিয়েছিলো সে।

ফুল মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—হুর, আমার হুর, তুমি সত্যি মরে গেছো? কেমন করে তুমি এলে এখানে? কে তোমার এ অবস্থা করেছে! রোদন করতে লাগলো ফুল।

কেশব বললো—ফুল, ওকে তুমি চেনো?

আমার স্বামী!

তোমার স্বামী?

হাঁ। কেশব ভাইয়া, দেখোনা ও বেঁচে আছে কিনা?

কেশব তাড়াতাড়ি বনহুরের বুকে কান লাগিয়ে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠে—ফুল, তোমার অদৃষ্ট ভাল। তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়নি, সে জীবিত আছে। এই দেখো বুকের কাছে---

ফুল বনহুরের বুকে কান লাগিয়ে দেখে, সত্যি বুকের মধ্যে স্পন্দন হচ্ছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ফুল—কেশব ভাইয়া, ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। ওকে বাঁচাও তোমরা।

কেশব উঠে দাঁড়ায়—ফুল, তুমি ওর কাছে থাকো, আমি বাবাজীকে ডেকে আনছি। তিনি ঔষধ দিলেই বাঁচবে বলে মনে হয়।

যাও, যাও কেশব ভাইয়া, ওকে বাঁচাতেই হবে।

কেশব চলে যায়।

ফুল লুটিয়ে পড়ে বনহুরের সংজ্ঞাহীন বুকের উপর। আকুল হয়ে কাঁদে—বনহুর, তোমার এ অবস্থা কেন। হায়, কে তোমার এ অবস্থা করেছে। বুকে-মাথায়-ললাটে হাত বুলিয়ে চলে ফুল। মুখের ধুলাবালি হাত দিয়ে মুছে দেয়। চুলগুলো সরিয়ে দেয় ললাট থেকে। তারপর নিজেকে সে স্থির রাখতে পারে না, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় সে বনহুরের গণ্ড ঠোঁট আর ললাট।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে আসে কেশব আর সন্ন্যাসী বাবাজী, ফুল সরে দাঁড়ায়।

কেশব বলে—বাবাজী, এই সেই লোক, দেখুন তো বাবাজী বাঁচবে কিনা?

সন্ন্যাসী বাবাজী বনহুরের অজ্ঞান দেহটার পাশে বালির মধ্যে বসে পড়লেন, তারপর বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন—অত্যন্ত ক্ষীণ আশা। বাঁচতে পারে, তবে আজ রাত্রি না কাটা পর্যন্ত কোনো ভরসা নেই।

ফুল লুটিয়ে পড়লো সন্ন্যাসী বাবাজীর পায়ে—বাবাজী, ওকে বাঁচান। ওকে বাঁচান বাবাজী। ও না বাঁচলে আমিও বাঁচবো না!

সব কেশবের মুখে শুনলাম মা। সব জানতে পেরেছি। তবে সবই সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা। কেশব, এসো ওকে কোন রকমে কুঠিরে নিয়ে যাই।

কেশব শক্তিমান যুবক।

বৃদ্ধ হলেও সন্ন্যাসী বাবাজী বলিষ্ঠ পুরুষ।

ফুলের দেহেও তো কিছু বল আছে।

সবাই মিলে বনহুরের সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে এলো কুঠিরে।

ফুল নিজের শয্যায় বনহুরকে শুইয়ে দিলো।

সন্ন্যাসী বাবাজীর চললো চিকিৎসা।

গাছের পাতার রস আর কতোরকম শিকড় থেতলে তার রস খাওয়াতে লাগলেন।

সমস্ত দিন চলে গেলো বনহুরের জ্ঞান ফিরলো না। পরপর নানা দুর্ঘটনায় তার পাল্‌স্‌ বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। সন্ধ্যা হলো, তারপর শুরু হলো রাত্রি।

ফুল অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। আর তালপাতার পাখায় বনহুরের মাথায় বাতাস করে যাচ্ছে। কেশব করছে সেবা আর ঔষধের পর ঔষধ জোগাচ্ছে সে।

সন্ন্যাসী বাবাজী নানাভাবে নানা ঔষধ খাওয়াচ্ছেন, আর দেহের ক্ষতে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছেন।

রাত্রি শেষ প্রহর--এবার হতাশ হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

ফুল সব সময় তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সে সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখে।

রাত্রি ভোর হয়ে এলো, সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখ কালো হয়ে উঠলো, বললেন তিনি—মা, তোর অদৃশ্য মন্দ, ওকে বাঁচাতে পারলাম না।

ফুল আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে, মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলো।

সন্ন্যাসী বাবাজীর চোখেও অশ্রু ঝরে পড়লো।

কেশব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে এমন ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে মোটেই অভিজ্ঞ নয়। লোকসমাজের অনেক কিছুই সে জানে না। শিশুকাল হতে সে সন্ন্যাসী বাবাজীর সঙ্গে গহন বনে বাস করে। নিজের সম্বন্ধেই কেশব জানে না কিছু। নারী-পুরুষ কি সম্বন্ধ তাও অভিজ্ঞতা ছিলো না ওর। ফুলকে দেখার পূর্বে কোনো নারীর সংস্পর্শে আসেনি সে কোনোদিন। তাই কেশব ফুলকে অবাক হয়ে দেখতো। ফুল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগতো তার মনে। কিন্তু ফুল তাকে কোনোদিন ধরা দেয়নি। ফুলের মধ্যে সে খুঁজে ফিরেছে তার অতৃপ্ত হৃদয়ের স্বাদ আহলাদ কিন্তু তা পুর্ণ হয়নি।

কেশব তাই অবাক হয়ে গেলো—একটি পুরুষের জন্য একটি নারীর কত আকুতি। বনহুরের জন্য ফুল যখন ব্যাকুলভাবে রোদন করছিলো, তখন কেশব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো এ দৃশ্য।

হঠাৎ সন্ন্যাসী বাবাজী বলে উঠেন—মা ফুল, এক কাজ করতে চাই।

বলুন বাবাজী?

আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই, ওকে বাঁচাতে পারি কিনা। রাত ভোর হয়ে এলো— তার পূর্বেই আমাকে সে কাজ করতে হবে। ফুল, আমি ওকে একটা জীবন্ত বড়ি খাওয়াবো। ঐ বড়ি সেবন করলে ও বাঁচবে কিন্তু ছয় মাস কোনো নারী মুখ দর্শন করা চলবে না!

তাই করুন, চাই না আমি ওর সম্মুখে আসতে, তাই করুন দেব। তবু যদি ও বেঁচে থাকে, সেই হবে আমার জীবনের পরম সম্পদ।

বেশ তাই হোক। সন্ন্যাসী বাবাজী তার ঔষধের থলে হতে একটি স্বর্ণকৌটা বের করলেন, এবং তার ভিতর হতে একটি জমকালো বড়ি বের করে হাতের তালুতে রাখলেন। কেশবকে বললেন তিনি সামান্য পানি দিতে।

কেশব পানি দিলো।

সন্ন্যাসী বাবাজী বড়িটা হাতের তালুতে আংগুল দিয়ে পানির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন, তারপর বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিলেন।

এবার তিন জোড়া চোখ অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

সন্ন্যাসী বাবাজী মন্ত্রপাঠ করছেন বিড়বিড় করে। আর মাঝে মাঝে ফুঁ দিচ্ছেন বনহুরের চোখেমুখে।

সেকি ব্যাকুল প্রতীক্ষা সকলের।

ভোর হয়ে আসছে।

গহন বনের কোনো অঞ্চলে বন্য মোরগ ডেকে উঠলো।

হঠাৎ কেশব আনন্দধ্বনি করে উঠলো— বাবাজী, দেখো দেখো ও বেঁচে উঠেছে। ও বেঁচে উঠেছে, নড়ছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী আর ফুল তাকালো একসঙ্গে।

বনহুর মাথাটা একটু একটু করে গড়াচ্ছে।

ফুলের মুখমণ্ডল খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, আনন্দে আত্মহারা হলো সে। অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো —বনহুর---

সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বাবাজী বললেন —ফুল, আমার নিষেধ আমান্য করো না। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ফুল নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো, বিমর্ষ হলো তার আনন্দ উচ্ছল মুখমণ্ডলখানা। ধীরে ধীরে উঠে কুঠির ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

কেশব আর সন্ন্যাসী বাবাজী বসে রইলো বনহুরের শিয়রে।

ফুল কুঠিরের বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো বনহুরের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিজকে যেন কোনোমতে সামলাতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ পর কানে ভেসে এলো তার বহু কামনার, বহু সাধনার সেই অতি পরিচিত কণ্ঠের ব্যথা কাতর আওয়াজ—উঃ --উঃ--উঃ--

ফুলের মন ছটফট করে উঠলো, পাশে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো তার প্রাণ। কিন্তু উপায় নেই, সন্ন্যাসী বাবাজীর আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। দু'হাতে বুক চেপে দাঁড়িয়ে রইলো ফুল।

আবার শোনা গেলো—মা, মাগো—উঃ---উঃ---পানি পানি--

ফুল ছুটে পাশের কুঠির থেকে গেলাসে পানি ঢেলে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালো।

কেশব বেরিয়ে আসতেই তার হাতে দিলো, বললো—কেমন আছে ও?

অনেক ভাল। পানির গেলাস নিয়ে ভিতরে চলে গেলো কেশব।

সূর্যের আলোর সঙ্গে বনহুর চোখ মেলে তাকালো।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেলো সন্ন্যাসী বাবাজীকে। পাশেই ছিলো কেশব, তাকেও দেখলো বনহুর। কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বললো—আমি কোথায়?

সন্ন্যাসী বাবাজী বললেন—দিল্লীর অদূরে কোনো এক জঙ্গলে তুমি এখন আছো।

বনহুর নিশ্চুপ পড়ে রইলো।

সন্ন্যাসী বাবাজী কেশবকে ছাগলের দুধ গরম করে আনতে বললেন।

ফুল সব শুনছিলো বাইরে দাঁড়িয়ে, সে তাড়াতাড়ি ছাগলের বাট থেকে দুধ সংগ্রহ করে গরম করে দিলো।

গরম দুধ খাওয়ার পর বেশ কিছু সুস্থ বোধ করলো বনহুর। নতুন করে জীবন লাভ করলো, দেহের ব্যথা অনেক কমে গেছে বলে মনে করলো সে। বনহুর বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিলো, বাধা দিলেন সন্ন্যাসী বাবাজী—অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে তোমাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি বৎস। আমার আদেশ—তুমি আমার অবাধ্য হবে না। তোমাকে তিন দিন তিন রাত্রি সম্পূর্ণ শয্যায় শয়ন করে থাকতে হবে।

বনহুর সন্ন্যাসীর দীপ্ত শুভ্র দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ পড়ে রইলো, পারলো না তাঁর অবাধ্য হতে।

বনহুর চোখ বুজে স্মরণ করতে লাগলো তার পূর্বের ঘটনা। খোদা তাকে কিভাবে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। ভয়ঙ্করী নদীর বুক থেকে কেমন করে এলো সে এ জঙ্গলে। মনে পড়লো লুসীর কথা। বেচারী মেয়েমানুষ —সাঁতার তেমন জানতো না, তাছাড়া ভীষণ ঢেউ-এর বুকে কোথায় তলিয়ে গেছে কে জানে। লুসীর ব্যথা করুণ মুখখানা বারবার ভাসতে লাগলো তার চোখের সম্মুখে। ওকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টাই সে করেছিলো, ওর জন্য সে অনেক করেছে, শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচাতে পারলো না সে। বনহুরের বুকে এজন্য অনেক বেদনা—লুসীকে সে রক্ষা করতে পারেনি। লুসী মরে ভালই হয়েছে—তার অভিশপ্ত জীবনের হয়েছে সলিল সমাধি। বনহুর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কিন্তু তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে আসে দু'ফোটা পানি।

বনহুর কুঠিরের মধ্যে একা বিছানায় নিশ্চুপ পড়ে আছে সন্ন্যাসী বাবাজী তার আশ্রমের কাজে ব্যস্ত। কেশব গেছে ফল আহরণে বনের মধ্যে।

ফুল একা ছট্ ফট্ করে কুঠিরের বাইরে। গুরুদেবের নিষেধ—বনহুরের পাশে তার যাওয়া হবে না। আকুলি বিকুলি করে সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

কুঠিরের মধ্য হতে ভেসে আসে বনহুরের কণ্ঠের আওয়াজ —উঃ উঃ মা, মাগো----

ফুলের চোখের পানি বাধা মানে না, পাষাণের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চমকে উঠে ফুল—কে যেন তার কাঁধে হাত রাখে।

ফিরে তাকায় ফুল, দেখতে পায় সন্ন্যাসী বাবাজী হাস্য-উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বলেন তিনি ফুলকে লক্ষ্য করে—মা ধৈর্য ধরো, ওকে যদি বাঁচাতে চাও তবে নিজেকে শক্ত করে নাও। মনে রেখো, ছয় মাস তোমার বনহুরের নারীদর্শন নিষেধ আছে।

ফুল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—কিন্তু আমি যে ওকে না দেখে থাকতে পারছি না বাবাজী?

নিজেকে পাষাণ করে নাও ফুল—তুমি সন্ন্যাসী কন্যা।

বাবাজী!

ফুল, ওর যাতে অমঙ্গল না হয় সেজন্য তোমাকে কঠিন সাধনা করতে হবে।

আমি তাই করবো বাবাজী। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন নিজেকে পাষাণ করে নিতে পারি।

যাও মা, আজ থেকে তুমি এ কুঠিরের আশে পাশে আসবে না। কারণ নিজেকে স্থির রাখতে পারবে না তুমি।

তাই হবে, আর আমি এখানে আসবো না বাবাজী।

ফুল চলে যায়। তখনও তার কানে ভেসে আসে অস্ফুট কণ্ঠ বনহুরের —মা, মাগো, উঃ---উঃ--

সন্ন্যাসী বাবাজী কক্ষে প্রবেশ করলেন, শান্ত-সৌম্য জ্যোতির্ময় দেবপুরুষ। শিয়রে এসে বসলেন বনহুরের, হাত রাখলেন তার মাথায়, ডাকলেন—বৎস?

বনহুর চোখ মেলে তাকালো, সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখে নজর পড়তেই বললো—বাবা!

এখন কেমন বোধ করছো?

ভাল নয়।

খুব কি অসুস্থ বোধ করছো?

না, কিন্তু মন বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাকে উঠবার আদেশ দিন বাবা?

আর একটা দিন তোমাকে এভাবে শুয়ে থাকতে হবে।

বনহুর হতাশভাবে চোখ বন্ধ করলো।

সন্ন্যাসী বাবাজী উঠে গেলেন তখনকার মত।

তিন দিন পর বনহুর সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। আবার তার দেহে পূর্বের সেই অসামান্য শক্তি ফিরে এলো। সন্ন্যাসী বাবাজীর স্নেহে আর কেশবের গভীর ভালবাসায় বনহুর মুগ্ধ হলো। ফলমূল আর নিরামিষ ভক্ষণ করতে লাগলো বনহুর সন্ন্যাসী বাবাজী আর কেশবের সঙ্গে।

❑

বনহুর সুস্থ হয়ে উঠার পর একদিন সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে এসে বললো—বাবাজী?

সন্ন্যাসী বাবাজী একটি হরিণ-শিশুকে আদর করছিলেন, বললেন তিনি—বলো বৎস?

এখন তো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি, এবার আমাকে বিদায় দিন।

আমি জানতাম তুমি এ কথাই আমাকে বলবে, কিন্তু তোমাকে যখন আমি কুড়িয়ে পেয়েছি তখন তুমি আমার সন্তানসম। তোমার ভাল-মন্দ এখন আমার। কাজেই তোমাকে এখানে ছ'মাস থাকতে হবে। তারপর যেখানে খুসী চলে যেও, আমি বাধা দেবো না।

সন্ন্যাসী বাবাজীর কথায় আঁতকে উঠে যেন বনহুর। তার মত উচ্ছৃঙ্খল জনের একস্থানে স্থির হয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব। এ ক'দিনেই বনহুর হাঁপিয়ে পড়েছে যেন। এরপরও ছ'মাস তাকে এ বনে নির্জীবের মত কাটাতে হবে—না না, পারবে না সে এক যায়গায় স্থির হয়ে থাকতে। বললো বনহুর—আমাকে আপনি গভীর স্নেহ করেন জানি। কিন্তু আমার পক্ষে ছ'মাস এখানে থাকা সম্ভব নয় বাবাজী।

সবই সম্ভব বৎস, এ দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়। অসম্ভবকে সম্ভব করাই হলো সাধকের সাধনা। আমার সঙ্গে তোমাকে তপস্যা করতে হবে ছ'মাস।

তপস্যা?

হাঁ বৎস। কি তপস্যা, কেন করতে হবে—এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে না কোনোদিন।

বাবা!

যদি মঙ্গল চাও আমার কথা মত কাজ করো।

কিন্তু--

জানি, যে রত্ন তুমি হারিয়েছো এই ছ'মাস কঠোর সাধনা করে তুমি তা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমার জীবন সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না বাবা, তাই আপনি আমাকে এসব কথা বলছেন। আমার জীবন অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

আমার জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অস্বাভাবিক নয় বৎস। আমি একদিন তোমাকে আমার জীবন-কাহিনী বলবো, দেখবে আমার মত অদ্ভুত জীবন কারো নেই।

বাবা!

জানি তুমি কে, কোথায় তোমার বাড়ি, কি তোমার আসল পরিচয়—সব আমি জানি বৎস। দস্যু হলেও তুমি মহান, তোমার আত্মা অতি পবিত্র---

বনহুরের চোখে রাজ্যের বিস্ময় জেগে উঠে—এ সন্ন্যাসী কি করে জানলো তার আসল পরিচয়! কি করে জানলো দস্যু হলেও মহান সে, তার আত্মা অতি পবিত্র!

সন্ন্যাসী বাবাজী সব শুনেছিলেন ফুলের কাছে। বনহুরের সব কথা সে নিঃসন্দেহে খুলে বলেছে সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে। কোনো কথাই সে লুকোয়নি—লুকোতে পারেনি।

বনহুরকে বিস্মিত হতে দেখে বললেন সন্ন্যাসী বাবাজী—শক্তিমান বীরপুরুষ তুমি। তোমার বীরত্বের কাহিনী আমি জানি, আরও জানি তুমি অসহায়ের বন্ধু। বৎস, তাইতো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার আমার এতো প্রচেষ্টা!

বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বাবা!

বৎস, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—তুমি ছ'মাসের মধ্যে কোথাও যাবে না।

বনহুর নিশ্চুপ; মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আদেশ যেন তার সমস্ত ধমনীকে শিথিল করে দেয়। একটি কথা সে প্রতিবাদ করতে সাহসী হয় না।

খুশী হন সন্ন্যাসী বাবাজী।

ববহুরকে সন্ন্যাসী বাবাজী তাদের গেরুয়া বসন পরতে দেন। খালি গা, একটা গেরুয়া কাপড় কাঁধের পাশ দিয়ে জড়ানো।

মাথায় একটি কাপড় পাগড়ীর মত করে বাঁধে সে।

এ ড্রেসে বনহুরকে অদ্ভুত মানায়।

সন্ন্যাসী বাবাজী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—অপূর্ব! জয়শ্রী জয়শ্রী মা দয়াময়ী---যাও বৎস, কেশবের সঙ্গে যাও।

বনহুর চলে গেলো কেশবের সঙ্গে।

ফুল এতোক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখছিলো।

বনহুর চলে যেতেই বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে, চোখ তার অশ্রুসিক্ত।

সন্ন্যাসী বাবাজী বলেন—ফুল, মা তোমার চোখে জল! কেন মা এতো বেদনা তোমার?

ফুল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—বাবাজী!

জানি তোর খুব কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু কি করব মা, যতদিন না সময় পুর্ণ হয়েছে ততদিন তোকে এভাবে সাধনা করতে হবে। জয়ী হলে মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হবে মা।

❑

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন হয়।

ফুল সব সময় বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ফুল নিজের হাতে রান্না করে, সন্ন্যাসী বাবাজীকে খাওয়ায়, তারপর সাজিয়ে

রাখে বনহুর আর কেশবের জন্য। সব শেষে নিজে খায়। পূর্বের সে চঞ্চলতা আর নেই ফুলের। ধীর-স্থির শান্ত বন-দুহিতার মত নিশ্চঞ্চল হয়ে পড়েছে সে।

কেশব আর বনহুর ফিরে আসার পূর্বেই কুঠিরের সব কাজ সমাধা করে আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ফুল। সন্ন্যাসী বাবাজী মানা করে দিয়েছেন বনহুরকে—কোনো সময় ভুল করেও যেন সে দক্ষিণ দিকের কুঠিরে প্রবেশ না করে।

বনহুর জীবনরক্ষাকারীর আদেশ অমান্য করতে চায় না। মনে নানা প্রশ্নের উদয় হলেও সে নিজেকে কঠিনভাবে সংযত করে রাখে।

বনহুর ফুলের অস্তিত্ব টের না পেলেও ফুল কুঠিরের বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখে বনহুরকে। দেখে প্রাণ ভরে—কত দিন ওকে দেখেনি সে।

বনহুরের সেই হাসি, সেই কথার সুন্দর ভঙ্গী, সেই অপুর্ব মনোমুগ্ধকর আঁখি দুটি ফুল অপলক চোখে দেখে। ছুটে এসে ওর প্রশস্ত বুকে মাথা রাখতে ইচ্ছা করে—কিন্তু উপায় নেই। কার যেন কঠিন আদেশে মনকে স্থির করে নেয় ফুল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

কেশব বনহুরের সঙ্গী-সাথী-বন্ধু—গহন বনে নিসঙ্গ অবস্থায় কেশব ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। কেশব অবশ্য বনহুরের চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হবে। তবু বনহুর আর কেশবের মধ্যে অত্যন্ত মিল।

বনহুর শুয়ে থাকে, কেশব বসে থাকে তার পাশে।

বনহুর বলে—কেশব!

বলো বন্ধু! কেশব বনহুরকে বন্ধু বলে ডাকে।

বনহুর বলে—কেশব, কেমন করে আমাকে পেয়েছিলে ভাই?

নদীতীরে জল আনতে গিয়ে।

কই, তুমি তো কোনোদিন নদী থেকে জল আনো না?

তখন আনতাম।

তুমিই তাহলে আমাকে দেখেছিলে?

না--হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি —আমিই তোমাকে দেখেছিলাম। কিন্তু বাবাজী না হলে তোমাকে আমরা কেউ বাঁচাতে পারতাম না।

আচ্ছা কেশব?

বলো?

এ বনে কি শুধু তোমরা দু'জনাই বাস করো?

এ প্রশ্ন কেন বলো তো?

না এমনি করলাম।

আর একদিন।

নদীতীরে এসে দাঁড়ায় বনহুর আর কেশব। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছিলো ওরা দু'জনা। হঠাৎ কেশব বলে উঠে—বন্ধু, দেখ ঐ খানে তোমাকে ফুল প্রথম দেখেছিলো--- না না, ফুল নয় আমি ---আমি তোমায় প্রথম দেখেছিলাম।

ফুল!

কেশব কথাটার মোড় ঘোরালেও বনহুর ধরে ফেলেছিলো। বললো —ফুল কে কেশব?

বললাম তো আমার আর এক নাম ফুল।

ওঃ তাই বলো।

চলো বন্ধু কাঠ সংগ্রহ হয়ে গেছে চলো।

বনহুর ছোট্ট কাঠের বোঝাটা কেশবের মাথায় তুলে দিয়ে নিজের মাথায় মস্ত বড় বোঝাটা উঠিয়ে নেয়। দস্যু সর্দার বনহুর আজ বনে বনে কাঠ সংগ্রহ করে ফেরে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে ফুল আর হাসে।

বনহুর যখন খেতে বসে—অবাক হয়ে ভাবে, তাদের খাবারগুলো রোজ এত সুন্দর করে কে পাক করে! সন্ন্যাসী বাবাজীতো সর্বক্ষণ তার জপ্ তপ্ আর সাধনা নিয়ে থাকেন। কেশব তো তারই সঙ্গে—কিন্তু এতো সব রান্না করে কে?

বনহুর বলে খেতে খেতে —কেশব, কে এমন সুন্দর করে আমাদের জন্য রোজ রান্না করে, খাবারগুলো পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে ভাই?

কেন ফুল---না না, সন্ন্যাসী বাবাজী নিজেই তো রোজ রান্না করেন। তুমি জানো না বন্ধু, বাবাজী কত সুন্দর পাকান!

কেশব বললেও বনহুরের যেন বিশ্বাস হয় না তার কথা। ফুল—কে সেই ফুল! কার নাম ফুল, তবে কি কেশবের আর এক নাম ফুল। হয়তো হবে—সন্ন্যাসীদের আবার নাম!

বনহুর খেয়ে-দেয়ে শোয়।

বনহুরের জন্য পূর্বদিকের কুঠিরখানা ছেড়ে দিয়েছে কেশব। ওটা আগে কেশবের কুঠির ছিলো। এখন সন্ন্যাসী বাবাজী আর কেশব শোয় পশ্চিমের কুঠিরে! পাশাপাশি তিনখানা কুঠির ছিলো সন্ন্যাস বাবাজীর। তালপাতার আর খেজুর পাতার ছাউনি করা এসব কুঠির সন্ন্যাসী বাবাজী আর কেশব নিজের হাতে তৈরি করেছে।

ফুলের জন্য আলাদা কুঠির।

সন্ন্যাসী বাবাজী রাতের বেলা ঘুমান না, তিনি গহন বনের মধ্যে অশ্বথ বৃক্ষতলে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসে যোগ সাধনা করেন। কাজেই তাঁর কুঠিরের এমন কোনো প্রয়োজন হয় না।

বনহুর নিজের কুঠিরে শয়ন করে।

খেজুর পাতার চাটাই এর উপর বালিশবিহীন তাকে শুতে হয়। শুধু তাকেই নয় সন্ন্যাসী বাবাজীর এখানে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা।

ফুল নিজের জন্য ভাবে না, ভাবে না সন্ন্যাসী বাবাজী বা কেশবের জন্য, কারণ এদের অভ্যাস আছে এ সবে। ফুল ভাবে বনহুরের কথা। না জানি বালিশবিহীন শয়ন করতে ওর কত কষ্ট হচ্ছে।

বনহুর দস্যু—ছোটবেলা হতেই সে মানুষ হয়েছে কঠিনভাবে। নানারকম কষ্ট সহ্য করাই হলো তার রীতি। বালিশবিহীন কেন, কতদিন সে শুধু পাথরের উপরে শুয়ে নিদ্রা গেছে। কত বন-জঙ্গলে কেটেছে তার রাত। তবু ফুল ওর জন্য ভাবে কত কথা।

❑

একদিন বনহুর নিদ্রা গেছে তার কুঠিরের মেঝেতে।

হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করেছে সে। এখানে আসার পর বনহুর অনেকটা নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারে। তাকে রাত জেগে গোয়েন্দাগিরি করতে হয় না। দুষ্ট দমনে সজাগ হয়ে থাকতে হয় না। লুসীকে উদ্ধারের জন্য নেই আর তার দুশ্চিন্তা। লুসী তার বিদগ্ধ জীবন নিয়ে সলিল সমাধির বুকে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে। বনহুর এখন নিশ্চিন্ত। প্রাণভরে ঘুমায় সে আজকাল।

প্রতিদিনের মত আজও বনহুর ঘুমিয়ে আছে তার খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর। হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে সে।

সন্তর্পণে কুঠিরের দরজা খুলে প্রবেশ করলো ফুল।

ওদিকে মাটির প্রদীপটা নিভু নিভু ভাবে জ্বলছে।

প্রদীপের ক্ষীণালোকে ফুল তাকালো কক্ষমধ্যে। অদূরে মেঝেতে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর নিদ্রিত বনহুর।

ফুল লঘু পদক্ষেপে বনহুরের শিয়রে এসে বসলো। নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে। ফুল অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো। মনে পড়লো সন্ন্যাসী বাবাজীর সাবধান বাণীর কথা। যেমন এসেছিলো ফুল তেমনি ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো সে।

এমনি আরও কতদিন ফুল এলো বনহুরের কুঠিরে।

বনহুর ঘুমাতো, ফুল অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণভরে দেখতো।

একদিন ফুল বনহুরের মাথায় হাত রাখলো আস্তে করে। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

অমনি বনহুর জেগে উঠলো —কে?

সঙ্গে সঙ্গে ফুল ছুটে পালিয়ে গেলো কুঠিরের মধ্য হতে।

অবাক বিস্ময়ে বনহুর তাকিয়ে আছে দরজার দিকে—ছায়ার মত অস্পষ্ট একটা নারীমূর্তি যেন সে দেখতে পেলো। বনহুর ভাবে, আরও কতদিন অন্ধকারে সে যেন তার কুঠিরে কারো অস্তিত্ব অনুভব করেছে। তার শিয়রে কারো দীর্ঘশ্বাস উপলব্ধি করেছে —কে—কে তবে সে? কোনো অশরীরী আত্মা? লুসীর আত্মা কি তবে তার পিছু নিয়েছে? হয়তো তাই হবে, কিংবা তার মনের খেয়াল। নইলে সন্ন্যাসীর আশ্রমে নারীমূর্তি আসবে কোথা হতে। বনহুর চাদর গায়ে দিয়ে ভাল হয়ে শোয়। মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সব চিন্তা। কিন্তু কি করে সে বিস্মৃত হবে, এ যে স্বপ্ন নয়—সত্য। এখনও তার মাথায় কারো যেন কোমল হস্তের স্পর্শ লেগে রয়েছে। এখনও তার কানে একটা নিশ্বাসের শব্দ যেন ভেসে আসছে।

তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

এমনি করে কতদিন ফুল লুকিয়ে থাকবে, অসহ্য যন্ত্রণার ছট ফট করে সে। বনহুরকে দূর থেকে যত দেখে ততই যেন অস্থির বোধ হয় তার মনে। কেঁদে কেঁদে ফুলের চোখ দুটো ফুলে গেছে, লাল হয়ে উঠেছে—তবু সে সহ্য করে থাকে।

সন্ন্যাসী বাবাজী সব বোঝেন, নীরবে তিনি সান্ত্বনা দেন। বলেন—এই তো আর ক'টা মাস, তাহলেই তোমাদের মিলন শুভ হবে মা, শুভ হবে। আমাদের সন্ন্যাসী ধর্মের রীতি অনুযায়ী তোমাকে মানতেই হবে আমার আদেশ।

মাথা নত করে ফুল মেনে নেয় সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা।

কিন্তু বনহুর বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আজকাল। কার যেন অস্তিত্ব তাকে আকর্ষণ করে। কার নিশ্বাসের শব্দ যেন তার চারপাশে শুনতে পায়। কার যেন পদধ্বনি বাজে তার কানে। কার এক অস্পশীয় ম্লান ছায়া যেন ভাসে তার চোখের সামনে।

বনহুর আর কেশব একদিন বসে ফল সংগ্রহ করছিলো! এক সময় তারা বিশ্রামের আশায় একটি বৃক্ষতলে এসে বসে ফল ভক্ষণ করছিলো।

বনহুর বৃক্ষটায় ঠেশ দিয়ে একটা ফল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো দৃষ্টি তার উদাস—কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে সে।

বললো কেশব—খেয়ে নাও।

কেশবের কথা কানে না নিয়ে বললো বনহুর—কেশব!

বলো?

একটা কথা সত্যি করে বলবে?

একটা কেন, যা জিজ্ঞাসা করবে সব বলবো।

আচ্ছা কেশব, তোমাদের আস্তানায় কি কোনো অশরীরী আত্মা আছে?

অশরীরী আত্মা? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো কেশব।

হাঁ, আমি দেখেছি একটা শুভ্রবসনা নারীমুর্তি।

আমাদের আশ্রমে নারীমূর্তি, বলো কি বাবু?

কেশব বনহুরকে মাঝে মাঝে বাবু বলে ডাকতো।

বললো বনহুর—কেশব, আমি যখন ঘুমাই তখন আমার শিয়রে যেন কেউ বসে থাকে। অন্ধকারে কেউ যেন আমার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। আমি স্পষ্ট অনুভব করি কারো শ্বাস—প্রশ্বাসের শব্দ।

কেশব বলো—কে সে? কে সে শুভ্র বসনা নারীমূর্তি।

কেশবের চোখেমুখে বিস্ময় জাগে, ভাবে তবে কি ফুল সন্ন্যাসীর আদেশ অমান্য করে বাবুর কুঠিরে যায়! তবে কি ফুল অন্ধকারে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয়! নিশ্চয়ই সে যায়।

কি ভাবছো কেশব?

কিছু না। হ্যাঁ, ভাবছি কে সে শুভ্র বসনা নারীমূর্তি। যে প্রতিদিন তোমার কুঠিরে প্রবেশ করে।

কেশব, আমি ভাবি আজ জেগে থাকবো, দেখবো সে কে। কিন্তু পারি না, কেন যেন নিজেকে কিছুতেই জাগিয়ে রাখতে পারি না। কেমন যেন সংজ্ঞাহারার মত হয়ে পড়ি আমি রাত্রিবেলায়।

কেশবের চোখদুটো ছানাবড়া হয়, কোনো কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে। হাতের অর্দ্ধ-খাওয়া ফলটা তেমনি রয়ে যায় কেশবের হাতে।

বনহুর বলে—আমি সন্ন্যাসী বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করবো একথা।

অমনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় কেশব —না না, ওকথা সন্ন্যাসী বাবাজীকে বলবে না। তাকে বললে মন্দ হবে।

তবে কি আমি---

আমি নিজে সন্ধান নেবো আমাদের আশ্রমে কোনো অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে কিনা।

বনহুর বলে উঠে—কেশব, আমার মনে হয় শুভ্র বসনা নারীমূর্তি অশরীরী আত্মা।

কেমন করে জানলে বাবু?

আমি জানি, ও আত্মা কার।

কার বাবু?

জানো কেশব, একটা মেয়েকে বাঁচবার জন্যই আমি নদীগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারিনি। নদী বক্ষের প্রচণ্ড তরঙ্গ তাকে

আমার কাছ হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিলো, কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলো সে কে জানে। নিশ্চয়ই তার মৃত্যু ঘটেছে। আমার মনে হয়, সেই অসহায় নারীর আত্মাই রাত্রির অন্ধকারে আমার চারপাশে বিচরণ করে ফেরে!

কেশব ঢোক গিলে বললো—হয়তো তাই হবে।

❑

সন্ধ্যার অন্ধকারে পা টিপে টিপে কেশব প্রবেশ করলো রান্নার চালা ঘরটায়। এক পাশে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। ফুল রান্না শেষ করে সকলের জন্য থালায় খাবার সাজিয়ে রাখছিলো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো কেশব।

ফুলের চুলগুলো পিঠে এলিয়ে পড়েছে। সাদা ধপধপে শাড়ী তার দেহে। ললাটে চন্দনের ফোটা। হাতে-গলায় ফুলের মালা জড়ানো।

প্রত্যেকটা থালায় সুন্দর করে খাবার সাজাচ্ছিলো ফুল।

সন্ন্যাসী বাবাজীর থালাটা ভিন্ন।

বনহুরের থালা ভিন্ন।

কেশব আর ফুলেরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন থালায় খাবার সাজিয়ে রাখছিলো! প্রতিদিন এমনি করেই খাবার সাজিয়ে রাখে সে।

দৈনন্দিনের মত আজও রাখছিলো।

বনহুর এখনও ফিরে আসেনি, সন্ন্যাসী বাবাজীর সঙ্গে সে গেছে নদীতীরে।

ফুল এই অবসরে খাবার গুছিয়ে রেখে সরে পড়বে।

কেশব দেখলো, ফুল খাবার সাজিয়ে একটা ছোট্ট মাটির বাটি থেকে কিছু তরল সবুজ পদার্থ ঢেলে দিলো বাবুর খাবারের থালায়।

সঙ্গে সঙ্গে কেশব চেপে ধরলো ফুলের হাত।

চমকে উঠলো ফুল।

কেশব বললো—একি করছো ফুল? বাবুর খাবারে তুমি একি মেশাচ্ছো?

ফুল নিশ্চুপ হয়ে পড়ে।

কেশব ফুলের হাত থেকে মাটির বাটিটা হাতে নেয়। লক্ষ্য করেই বলে উঠে—ফুল, তোমার উদ্দেশ্য আমি জানতে পেরেছি। তুমি চুরি করে সন্ন্যাসী বাবাজীর নেশার ঔষধ বাবুর খাবারে মেশাচ্ছো?

অস্ফুট শব্দ করে ফুল—কেশব ভাই!

এ তুমি কি করছো ফুল?

আমাকে তুমি তিরস্কার করো!

ফুল, আমি সব শুনেছি বাবুর মুখে। তুমি তার খাবারে নেশার ঔষধ মিশিয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলো। তারপর তার পাশে যাও। জানো এর পরিণতি কি হবে?

কেশব ভাই, আমি যে ওর পাশে না গিয়ে পারি না। আমার মন যে অস্থির হয়ে পড়ে।

তাই তুমি ওর খাবারে---

হাঁ, সত্যি আমি তার খাবারে রোজ বাবাজীর---

বুঝেছি। কিন্তু যদি জানতে পারেন সন্ন্যাসী বাবাজী তখন কি হবে!

ওর কাছে না গেলে আমি বাঁচবো না কেশব ভাই। এতো কাছে থেকেও ওর পাশে যেতো পারবো না?

তা হবে না। যা করেছো এতোদিন তাই গোপন রাখতে চেষ্টা করো। নইলে আমি সন্ন্যাসী বাবাজীকে বলে দেবো।

তোমার পায়ে পড়ি কেশব ভাই। আমার দুঃখ তুমি বোঝ, জানো আমি কত বড় হতভাগী! আমাকে তুমি বাঁচাও---

এমন সময় দূরে শোনা যায় সন্ন্যাসী বাবাজী আর বনহুরের গলার আওয়াজ।

ফুল চলে যায় নিজের ঘরে।

কেশব বেরিয়ে আসে বাইরে।

❑

একদিন কাঠ সংগ্রহে গিয়েছিলো বনহুর একা।

কেশব সেদিন আশ্রমের কোনো কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলো। সন্ন্যাসী বাবাজীও গিয়েছিলেন আশ্রমের বাইরে।

বনহুর শরীর অসুস্থ বোধ করায় আজ সকাল সকাল ফিরে এলো কুঠিরে।

ফুল তখন উঠানে ওদিক মুখ করে মালা গাঁথছিলো।

বনহুর উঠানে পা দিতেই ফুল চমকে উঠে ফিরে না তাকিয়েই ছুটে পালিয়ে যায় কুঠিরের মধ্যে।

বনহুর কাঠের বোঝাটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে অবাক হয়ে তাকালো।

ফুল কুঠিরে প্রবেশ করে দরজা খিল বন্ধ করে দিলো।

বনহুর ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো দরজার সামনে, মৃদু ধাক্কা দিলো।

কিন্তু ফুল দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পর পর আঘাত করতে লাগলো বনহুর দরজায়। ওদিকে ফুল বিপদে পড়লো। সে দ্রুত খিড়কি জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, যেখানে কেশব

কাজ করছিলো। বললো ফুল—কেশব ভাই, সব ফাঁস হয়ে গেছে, আমাকে সে দেখে ফেলেছে—হঠাৎ অসময়ে এসে গেছে হুর।

তা আমি এখন কি করবো?

শোন,আমি যা বলি তাই করো, আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও কেশব ভাই। এই নাও আমার কাপড় এনেছি, এটা পরে মেয়েমানুষ সেজে নাও।

তারপর?

তারপর আমার কুঠিরের খিড়কি জানালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দরজা খুলে দেবে।

কেশব বিস্ময়ে হতবাক হয়, বলে সে—এসব কি বলছো ফুল, আমি সাজবো মেয়েমানুষ?

কেশব ভাই, এ ছাড়া উপায় নেই। আমার বনহুর দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাকুল আগ্রহে সে বারবার দরজায় আঘাত করছে। যাও, যাও কেশব ভাই, তুমি তার মনের সন্দেহ দূর করো, সে যেন বুঝতে না পারে—এ আশ্রমে কোনো নারী আছে।

বেশ যাচ্ছি।

যাও কেশব ভাই।

কেশব চলে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে বনহুর ডাকে—দরজা খোল, কে তুমি—আমি দেখতে চাই। দরজা খোল।

দরজা খুলে গেলো।

কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। দেখলো সে, একপাশে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি।

বনহুর বললো —কে তুমি?

তবু নিরুত্তর।

বনহুরের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো, সে খপ্ করে ধরে ফেললো, তারপর মাথার কাপড় সরিয়ে ফেলতেই বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—কেশব!

হেসে উঠলো কেশব, বললো—মাফ্ করো বাবু।

একি তামাসা?

বাবু।

তুমিই তা হলে এতোদিন আমাকে ধোকা দিয়ে এসেছো কেশব?

হাঁ।

তোমার উদ্দেশ্য কি?

আমার সখ।

বনহুর বেরিয়ে গেলো কুঠিরের মধ্য হতে।

❑

অত্যন্ত সাবধানে নিজেকে বনহুরের অগোচরে লুকিয়ে রাখলো ফুল। যতক্ষণ বনহুর উঠানে থাকতো ততক্ষণ ফুল তার কুঠিরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো। বনহুর বেরিয়ে গেলে তবে বের হতো সে।

চঞ্চলা ফুল কত কষ্ট করে যে নিজেকে শক্ত করে রেখেছিলো, সেই জানে। বনহুর চলে যেতো, ফুল তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতো।

হয়তো কোনোদিন পিছন থেকে সন্ন্যাসী বাবাজী এসে কাঁধে হাত রাখতেন।

চমকে উঠতো ফুল। তাড়াতাড়ি আঁচলে অশ্রু মুছে ফেলতো।

সন্ন্যাসী বাবাজী বলতেন—পাগলী মেয়ে, ছিঃ কাঁদতে আছে! এই তো তোর সাধনা শেষ হয়ে এলো বলে।

ফুল নিশ্চুপ হয়ে শুনতো।

এমনি করে একদিন শেষ হলো ফুলের সংযম সাধনা।

ছ'মাস পুর্ণ হলো।

কেশব একরাশ বন্য ফুল নিয়ে হাজির।

বনহুর বললো —এসব কি হবে?

বললো কেশব—আজ যে নবরাত্রি।

নবরাত্রি মানে? প্রশ্ন করলো বনহুর।

মানে নতুন রাত, বলে হাসে কেশব।

কেশব বনহুরের কুঠিরখানা আজ ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিলো। বাঁশের খুঁটিগুলোতে জড়িয়ে দিলো ফুলের মালা। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো রাশিকৃত ফুল। নতুন খেজুর পাতার চাটাইখানায় ফুল দিয়ে শয্যা তৈরি করলো।

হাসে বনহুর, বলে সে—এসব কি পাগলামি হচ্ছে তোমার কেশব?

আজ তোমার সাধনা শেষ হয়েছে বাবু।

কই, আমি তো কোনো সাধনা করিনি?

কে বললো তুমি সাধনা করোনি। যেদিন তুমি জ্ঞান লাভ করেছো বাবু সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তোমার যোগ সাধনা। আজ তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছো।

কেশব!

হাঁ বাবু।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

আজ ফুলের মনে সেকি চঞ্চলতা, কিসের যেন এক উন্মাদনায় ফুল আত্মহারা! যেমন তার আনন্দ, তেমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর সংকোচ তাকে কুঁকড়ে ফেলেছে। লজ্জায় সে আজ সন্ন্যাসী বাবাজীর সম্মুখে আসতে পারেনি।

কেশবকে দেখে কুঠিরে প্রবেশ করেছে, তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেনি ফুল।

রাত বেড়ে আসছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী চলে যান তাঁর যোগ সাধনা স্থানে। যাবার সময় বলে যান—মা ফুল, তুমি তোমার স্বামী-সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

সন্ন্যাসী বাবাজী চলে যান।

ফুল আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত শরীরে, শিরায় শিরায় তার এক অভূতপূর্ব শিহরণ জাগে। কিসের যেন এক অনুভূতি তার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করতে থাকে।

বনহুর কুঠিরে প্রবেশ করে।

পিছনে কেশব।

ধূপ আর চন্দনের গন্ধে কুঠিরখানা মোহিত হয়ে আছে। ওপাশে মাটির প্রদীপে ঘি-এর বাতি জ্বলছে। ফুলে ফুলে সমস্ত কুঠির ছেয়ে আছে যেন। মেঝের এক পাশে খেজুর পাতার চাটাইখানায় ফুলের শয্যা পাতা।

কুঠিরে প্রবেশ করে বলে বনহুর—এ সব কি হয়েছে?

হাসে কেশব।

বনহুর শয্যায় এসে বসে বলে—কেশব, আজ কি আমার ফুলশয্যা?

বলে কেশব—মনে করো তাই

কিন্তু কনে কই?

সন্ন্যাসী বাবাজীর তপস্যায় কনেও আসবে। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় কেশব।

বনহুর শয্যায় শুয়ে পড়ে।

কেশব এসে দাঁড়ায় ফুলের কাছে—ফুল, যাও ও তোমার প্রতীক্ষা করছে।

ফুল নত করে মাথা।

কেশব চলে যায় নিজের শয়ন স্থানে।

ফুল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে তার নিজের কুঠিরের মেঝেতে। একটি পা সে আজ নড়াতে পারছে না। কে যেন শিকল দিয়ে তার পা দু'খানা বেঁধে ফেলেছে। কই, ফুলের তো এমন লজ্জা ছিলো না কোনোদিন —আজ এমন হচ্ছে! বুকের মধ্যে কেন এমন আলোড়ন জাগছে।

রাত ক্রমেই গভীর হয়ে আসছে।

ফুল নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর তার কুঠিরে শুয়ে ভাবছে কত কথা। আজ ফুল ছড়ানো বিছানায় শুয়ে, ধূপ আর চন্দনের গন্ধে বার বার কেন যেন মনে পড়ছে একজনের কথা—সে হলো নূরী। এমনি এক রাতে গহন জঙ্গলে, হিংস্র জীবজন্তুর গহ্বরে শয়ন করে পাশে পেয়েছিলো সে নূরীকে। তার ছোটবেলার সাথী, সঙ্গিনী, সহচরী নূরী।

আজ কেন বার বার ওর মুখখানাই ভাসছে বনহুরের চোখের সম্মুখে। সেই চঞ্চল বনবালা। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বাদাড়ে ঝরণার ধারে ধারে সেই চঞ্চল চরণের নুপুর ধ্বনি। বনহুর আনমনা হয়ে যায়, বেদনায় ভরে উঠে তার মন—আর কোনোদিন সে ফিরে আসবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে আসে। পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে।

ওদিকে প্রদীপটা প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর।

আজ পুর্ণিমা।

জ্যোছনা প্লাবিত আকাশ।

সমস্ত বনভুমি ঝলমল করছে জ্যোছনার আলোতে।

রাতজাগা পাখি গাছে গাছে পাখা ঝাপটায়।

বনহুরের দরজা খুলে যায়।

কক্ষে প্রবেশ করে ফুল।

মন্থর গতিতে এগিয়ে যায় বনহুরের বিছানার পাশে।

চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে, নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বনহুরের ঘুমন্ত সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে। চোখের পাতা যেন পড়তে চায় না। ফুল হারিয়ে ফেলে আপন সত্তা। বসে পড়ে সে বনহুরের শয্যার পাশে। হাত রাখে ফুল বনহুরের ললাটে।

বনহুর হয়তো তখন কোনো এক সুন্দর মধুময় স্বপ্ন দেখছিলো। ফুলের স্পর্শে নিদ্রা টুটে যায়, আচমকা জেগে উঠে বসে বনহুর।

খপ্ করে ধরে ফেলে ওর হাতখানা। বলে উঠে—কে তুমি? কেশব! কনে সাজার এতো সখ তোমার?

ফুল মাথাটা নত করেছিলো।

বনহুর মুখের নিচে হাত দিয়ে এক ঝটকায় সোজা করে দেয়।

প্রদীপের আলো ফুলের মুখে পড়তেই অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর— নূরী!

ফুল স্থির হয়ে বসে থাকে।

বনহুরের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, অবাক হয়ে বলে সে—একি স্বপ্ন দেখছি!

নূরী এবার কথা বলে—হুর, স্বপ্ন নয়।

তুমি বেঁচে আছো নূরী, এ যে আমার কল্পনার অতীত!

বনহুর প্রবল আবেগে নূরীকে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বুকে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে আবার—নূরী, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সত্যি তুমি আমার সেই নূরী কিনা, না তুমি কোনো মায়াবিনী?

নূরীর দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দ অশ্রু, কোনো কথা সে বলতে পারে না। সমস্ত ভাষা যেন তার হারিয়ে গেছে আনন্দের অতিশয্যে।

বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে শান্ত স্থির কণ্ঠে ডাকে —হুর! আমার বনহুর!

নূরী, বলো—তুমি সত্য না মিথ্যা?

আমি সত্যই তোমার সেই নুরী---

বনহুর নূরীর দেহটা বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। ললাটে গণ্ডে চিবুকে অসংখ্য চুম্বন করে চলে। বনহুর যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তার হারানো রত্ন যেন ফিরে পেয়েছে সে।

নূরী ওকে বাধা দেয় না কোনো।

মাটির প্রদীপটা নিভে যায়।

বেড়ার ফাঁকে জ্যোছনার আলো লুটিয়ে পড়ে কুঠিরের মেঝেতে।

বনহুরের বাহু বন্ধনে নূরী।

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপরে ছড়িয়ে আছে ফুলগুলো, জ্যোছনার আলোতে হাসছে যেন ওরা।

বনহুর ডাকে—নূরী!

বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে নূরী। বনহুরের হাতখানা তার হাতের মুঠায়, বলে—উঁ।

আমার সঙ্গে এতো ছলনা করলে কেন?

ছলনা নয় হুর, তোমাকে পাওয়ার সাধনা। সন্ন্যাসী বাবাজী যখন বললেন ওকে বাঁচানোর একমাত্র ঔষধ আছে আমার কাছে, সেই ঔষধ খেলে ও বাঁচবে কিন্তু ছ'মাস কোনো নারীমুখ দর্শন করা চলবে না। পারবে তুমি ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে?

এবার বুঝেছি, তাই তুমি পালিয়ে ছিলে আমার দৃষ্টির আড়ালে। কি কঠিন তুমি নূরী! পারলে ছ'মাস ধরে এমনিভাবে আত্মগোপন করে থাকতে?

হুর, জানো না কি দুর্বিসহ বেদনা নিয়ে আমি রাতের পর রাত ছট্‌ফট্‌ করেছি। সন্ন্যাসী বাবাজীর আদেশ তবু অমান্য করার সাহস পাইনি, আবার যদি তোমাকে হারাতে হয়!

হেসে উঠে বনহুর হাঃ হাঃ করে, হাসি থামিয়ে বলে—এ যুগের মানুষ তুমি ওসবে বিশ্বাস করো?

না না, ও কথা মুখে এনো না হুর। আমি যে অনেক কষ্ট করে, অনেক সাধনা করে তবেই তোমায় ফিরে পেয়েছি। বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে নূরী—এবার তোমাকে ছাড়ছি না হুর।

আমিও তোমাকে হারাতে চাই না নূরী।

❑

বনহুরের স্পর্শে নূরী ফিরে পায় তার আগের জীবন। চঞ্চলা হরিণীর মত ক্ষিপ্র হয়ে উঠে; বনে বনে ছুটো ছুটি করে বেড়ায়। কেশব-আর বনহুর যখন বনে কাঠ কাটে, নূরী তখন কাঠগুলো বোঝা বাঁধে। বনহুর যখন গাছের উপর চেপে ফল পাড়ে, নূরী তখন ফলগুলো কোঁচড়ে কুড়িয়ে নিতে থাকে।

বনহুর আর কেশব নূরীকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা।

পাহাড়ী ঝরণার মত নূরী নাচে।

বনহুর আর কেশব মাদল বাজায়।

সন্ন্যাসী বাবাজীও দেখেন তাকিয়ে তাকিয়ে। তিনিও মুগ্ধ হয়ে যান। গোটা বনভূমি যেন উচ্ছ্বল হয়ে উঠে। গাছে গাছে নতুন স্পন্দন জাগে। ডালে ডালে পাখি গান গায়। ঝরণার সচ্ছ জলে রাজহংসী ডানা মেলে সাঁতার কাটে। আকাশে উড়ে বেড়ায় শুভ্র বলাকার ঝাক্।

বনহুর যখন শুয়ে থাকে ঘাসের বিছানায় তখন নূরী বসে থাকে তার পাশে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

বনহুর যখন যেখানে যায়, নূরী সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে থাকে ছায়ার মত।

সন্ন্যাসী বাবাজীর আনন্দ আর ধরে না, তিনি এই যুবক আর যুবতীর মিলনে হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভব করেন।

কেশবও তাই, সে সব সময় ওদের খুশী রাখার চেষ্টা করে। কেমন করে ওরা দু'জনা নিশ্চিন্ত মনের আনন্দে থাকবে, এই করতো সে।

নূরী নদীতীরে যেতো পানি আনতে; সঙ্গে যেত বনহুর। নদীবক্ষ থেকে কলসী ভরিয়ে দিতো সে। নদী তীরে দাঁড়িয়ে কলসী কাঁখে তুলে নিতো নূরী।

এমনি এক বৈকালে নূরী আর বনহুর নদীতীরে গেলো পানি আনতে।

এখন নদী শান্ত। বর্ষাকালের মত আজ আর তার ভয়ঙ্করী রূপ নেই। নেই সেই প্রচণ্ড দাপট আর ভয়ঙ্কর ঢেউ-এর উচ্ছলতা।

বনহুর আর নূরী নদীতীরে এসে দাঁড়ালো।

নূরী বললো—এমনি এক বৈকালে আমি তোমায় নদীতীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। জানিনা হুর, সেদিন কার মুখ দেখেছিলাম।

নূরী, সত্য আমি বড্ড অপেয়।

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—একি কথা বলছো হুর। তুমি যে অমূল্য সম্পদ। লক্ষ লক্ষ্য রত্নের চেয়ে তুমি মূল্যবান--

বনহুর হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ।

নূরী স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে, এমন করে বনহুরকে কতদিন সে হাসতে দেখেনি।

নূরীকে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো বনহুর—কি দেখছো নূরী?

হুর! আরও হাসো, হাসো তুমি, তোমার হাসি আমি যে কতো দিন দেখিনি।

নূরী!

বলো হুর?

আমি যদি অপেয় না হবো, তাহলে এতোবার পানিতে ডুবে তবু বেঁচে যাই! নদীবক্ষ আমাকে তার শান্ত কোলে আশ্রয় দিতে রাজী নয়, তাই ডুবেও বেঁচে আছি নূরী।

কি যে বলো? খোদা তোমাকে রক্ষা করেছেন। তোমার মত একটা নিষ্পাপ জীবন বিনষ্ট করবেন না তিনি কখনও।

আবার বনহুর হেসে উঠলো, অট্টহাসির শব্দে নদীতীরে প্রতিধ্বনি জাগলো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—নিষ্পাপ! নিষ্পাপ জীবন আমার? হাঃ হাঃ হাঃ নূরী তুমি কি পাগল হয়েছো?

বনহুর!

নূরী তুমি জানোনা আমি জীবনে কত পাপ করেছি। কত ধনবানের ধন-ভাণ্ডার লুটে নিয়ে সাগারবক্ষে নিক্ষেপ করেছি। কত জীবন আমি বিনষ্ট করেছি আমার এ হাত দু'খানা দিয়ে। আর তুমি বলছো আমি নিষ্পাপ।

এ সব কি আমি জানিনা বনহুর? আমি কি আজ তোমায় নতুন দেখছি। তোমার কিছুই আমার অজানা নেই।

তবে কেন আমাকে এত উঁচুতে তুলে ধরো তোমরা। তোমাদের মুখে আমার এ সুনাম সহ্য হয় না নূরী।

হুর! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো নূরী।

বনহুর বললো—নূরী, তুমি জানো না আমি কত বড় অন্যায় কাজ করেছি। কত বড় জঘন্য কাজ আমি করেছি। মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করে, মিথ্যা ভালোবাসা দেখিয়ে একটি নিষ্পাপ সরল মেয়েকে প্রবঞ্চনা করেছি।

এ সব কি বলছো হুর?

হাঁ, বাংলাদেশে একটি মেয়ে আমাকে ভালোবেসেছিলো। নূরী, ওর জন্যই আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছিলাম আমার মধ্যে। ওর মধ্যে আমি পেয়েছিলাম আমার হারানো সুর। মেয়েটি আমাকে সরল বিশ্বাসে উজাড় করে দিয়েছিলো তার সব কিছু।

কথাটা শোনামাত্র নূরী ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠে—কি বললে? তুমি অস্পৃশ্য---

হাসে বনহুর।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—তুমি, তুমি তার সব কিছু গ্রহণ করেছিলে? পারলে তুমি এতো নীচে নামতে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ন্যায়-নীতি কিছুই কি নেই তোমার?

দস্যুর আবার ন্যায়-নীতি। তাই তো বললাম, আমি নিস্পাপ নই নূরী। শুধু তাই নয়—আমি প্রবঞ্চক।

বনহুর দেখলো, নূরীর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। রাগতঃভাবে চলে যাচ্ছিলো সে বনহুরের কাছ থেকে। চট্ করে বনহুর ধরে ফেললো নূরীর হাতখানা। ওর চিবুক তুলে ধরে বললো—তুমি ভুল বুঝছো নূরী। সবকিছুর মানে কি তুমি ব্যভিচার মনে করেছো?

নূরী অধর দংশন করছিলো।

বললো বনহুর —নিষ্পাপ ছিলো ওর ভালবাসা। নূরী, আমার ভালবাসা ছিলো ছলনামাত্র। তাইতো সে দিলেও আমি গ্রহণ করতে পারিনি। আর পারিনি বলেই আজ আমি অনুতপ্ত।

নূরী অবাক হয়ে তাকালো, বনহুরের কথাগুলো ঠিক্ যেন বুঝে উঠতে পারছে না সে।

বললো আবার বনহুর—নিজকে কতখানি পাষাণ করে নিয়েছিলাম, তাইতো আমি পেরেছি তাকে প্রবঞ্চনা করতে। সরল-সহজ একটি মেয়েকে প্রবঞ্চনা করার মত পাপ বুঝি আর কিছু নেই। নূরী, আমি তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে তুলে দিয়েছিলাম তাকে আর একজনের হাতে। তার সঙ্গে আমি করেছি চরম ছলনা।

কে সে মেয়ে? কি তার নাম?

অজানা অচেনা এক মেয়ে, হিন্দু বা মুসলমান সে নয়। খৃষ্টান জাতি—নাম তার শ্যালন। অদ্ভুত মেয়ে ছিলো শ্যালন। নূরী, ওর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তোমাকে।

হুঁ, এতোই যদি ভাল লেগেছিলো তাহলে তাকে সঙ্গী করে নিলে না কেন?

অহেতুক রাগ করছো নূরী। আমি তার ভালবাসায় অভিভূত হয়েছিলাম সত্য কিন্তু পারিনি তাকে গ্রহণ করতে। তার ভালবাসার বিনিময়ে সে পায়নি আমার কাছে কিছু। হয়তো এতোটুকু দিতে পারলে আজ আমি এতোখানি অনুতপ্ত হতে পারতাম না। নূরী, জীবনে বহু নারীই আমার সংস্পর্শে এসেছে বা আমিই গিয়ে পড়েছি তাদের সান্নিধ্যে। আমি দেখেছি তাদের আসল রূপ, কারো আচরণে বিস্মিত হয়েছি, কারো আচরণে ব্যথায় মুষড়ে পড়েছি, কারো আচরণে হয়েছি মুগ্ধ। সবাই যেন আমার কাছে কিছু চেয়েছে, কিসের আশায় যেন উন্মুখ রয়েছে ওরা। নূরী, আমি পাষাণ নই— মানুষ। নিজেকে কিভাবে যে আমি সংযত রেখেছি তুমি তা জানো না।

হুর!

নূরী, তোমাকে ফিরে পেয়েছি—এই আমার জীবনের চরম পাওয়া। আমি ভাবতেও পারিনি তোমাকে আবার পাবো।

হুর, চলো তবে আবার আমরা আস্তানায় ফিরে যাই। কান্দাই জঙ্গলের আকাশ বাতাস আমায় ডাকছে। নাসরিন, দাইমা—ওরা সবাই যে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে হুর।

হাঁ, আমার মনও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠে আস্তানায় ফিরে যাবার জন্য। অনেক দিন হলো আস্তানা ত্যাগ করে চলে এসেছি। না জানি সেখানের অবস্থা এখন কেমন।

হুর, সত্যিকার একটা কথা আমায় বলবে আজ?

নূরী, তোমার কাছে আমার না বলার তো কিছুই নেই।

আমার মনি কোথায় তুমি জানো?

মনি! সে এখন তার মায়ের কাছে।

মায়ের কাছে? অবাক কণ্ঠে বলে নূরী।

হাঁ নূরী তোমার মনি তার মায়ের কাছে ভালই আছে।

তার মা! কে—কে আমার মনির মা? বলো—বলো হুর?

তুমি রাগ করবে না তো?

না। আমার মনি যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে তার কথা শুনে আমি রাগ করবো, কি যে বলো!

সত্যি বলছো?

হাঁ এই তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করছি, আমি আমার মনির মায়ের পরিচয় জানতে পারলে খুশী হবো। আমি কান্দাই ফিরে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাবো।

পারবে! পারবে তাকে অভিনন্দন জানাতে?

আমার মনি যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে সে যে আমার পরম শ্রদ্ধেয়--

নূরী---অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুর। একটু থেমে বলে সে—নূরী, মনে করো মনি তোমারই সন্তান কারণ আমি তার জন্মদাতা।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী ছিটকে সরে যায় বনহুরের কাছ থেকে। মুখমণ্ডল অমাবস্যার অন্ধকারের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

বনহুর হতভম্ব হয়ে পড়ে।

নূরী ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ করতে থাকে। এ মুহূর্তে সে মনিকে সম্মুখে পেলে ছিঁড়ে ফেলতো যেন টুকরা টুক্‌রা করে। পরক্ষণেই বনহুরের বুকের কাছে জামাটা এঁটে ধরে ভীষণভাবে। তারপর উন্মাদিনীর মত কিল চড় দিতে থাকে বনহুরের বুকে —না না, এ হতে পারে না। এ হতে পারে না।

বনহুর মৃদু হাসে—কি হলো নূরী? কি অন্যায় আমি করেছি?

আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার পাশে আমি অন্য নারীকে ভাবতে পারি না। অসহ্য অসহ্য--- কেন, কেন তুমি বললে এ কথা? নূরী কেঁদে উঠে উচ্ছ্বসিতভাবে।

বনহুর নূরীকে টেনে নেয় কাছে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে—নূরী, তুমি জানো মনিরাকে আমি বিয়ে করেছি আমাদের মুসলমান ধর্ম অনুসারে। আমার স্ত্রী সে।

মনি তা হলে---

হাঁ, সে মনিরার সন্তান, আমারও।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে নূরী—চৌধুরী কন্যা মনিরার সন্তান মনি। না না, আমি সহ্য করতে পারবো না। আমাকে এ কথা কেন শোনালে হুর? আমাকে এ কথা কেন শোনালে---

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে, নূরীকে সজোরে সরিয়ে দিলে বলে—নূরী, অন্যায় আমি করিনি। মনিরাকে আমি বিয়ে করেছি, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছে।

উঃ আমি কেন বেঁচে রইলাম। কেন আমার মরণ হলো না। আমি জানি এক জিনিস কোনোদিন দু'জনার হয় না। বনহুরের জামাটা আবার মুঠায় চেপে ধরে নূরী—তুমি যে শুধু আমার, এটাই আমি জানি।

নূরী, আমি তো তোমারই রয়েছি।

তা হয় না। তোমার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। তোমাকে আমি আর ধরে রাখতে পারবো না।

নূরী, বিশ্বাস করো আমি যেমন তোমার তেমনি মনিরার।

এক হৃদয় কোনোদিন দু'জনাকে দেওয়া যায় না হুর। কেউ তা পারে না।

তুমি তো জানো নূরী, বনহুর কারো সমকক্ষ নয়। কেউ যা করে না, তাই সে করে। কেউ যা ভাবে না তাই সে ভাবে। অসম্ভবকে সম্ভব করাই হলো তার নীতি। মনিরাকে ইসলাম ধর্মমতে বিয়ে করেছি, আর তোমাকে খোদা সাক্ষী রেখে। লোক সমাজের কেউ জানে না তুমি আমার কে—শুধু রহমান ছাড়া। তবু তোমরা দু'জন আমার কাছে সমান অধিকারী --নূরী, আমার উপর রাগ করোনা লক্ষ্মীটি!

নূরী নীরবে অশ্রু মোছে।

বনহুর ওর মুখখানা তুলে ধরে —হাসো। হাসো নূরী। নিজের হাত দিয়ে নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দেয়, ললাটে একে দেয় চুম্বন রেখা।

নূরী বলে—আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে না তো কোনোদিন?

না। তোমার পাশেই তো থাকবো আমি। নূরী, তুমি যোগাবে আমার মনে দুর্দমনীয় সাহস আর উৎসাহ। মনিরা যোগাবে সান্ত্বনা আর শক্তি। তুমি দেবে প্রেম—ভালবাসা উজাড় করে আর মনিরা দেবে স্নেহ—প্রীতি আর প্রেরণা। তোমাদের দু'জনার কাছেই আমি চাই আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের অফুরন্ত খোরাক। বলো পারবে দিতে?

নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে উঠে—পারবো।

বনহুর ওকে প্রবল আবেগে নিবিড়ভাবে আবেষ্টন করে।

ঠিক্ সে মুহূর্তে পিছনে কেশে উঠে কেশব।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে দাঁড়ায়, হেসে বলে—তুমি কখন এলে কেশব?

বললো কেশব—এই তো এখনই এলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু তোমাদের ফিরবার নাম নেই।

বললো বনহুর—তাই বুঝি এসেছো বোনের সন্ধানে?

কেশব বললো—চলো এবার।

কেশব, তুমি যখন এসেছো তখন বসো, কথা আছে তোমার আর নূরীর সঙ্গে।

বাবাজী ব্যস্ত হবেন। বললো

কেশব বললো—বাবাজী শহরে গেছেন, এখনও ফিরে আসেননি।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর —সেই যে সকালে গেছেন এখনও ফিরে আসেননি তিনি?

না, তাছাড়া শহর তো আর নিকটে নয়। বহু দূরের পথ। এমনি বুঝি রাত হয়ে যায় তার ফিরতে! বললো বনহুর। কেশব বললো—রাত কোনোদিন হয় না, তবে সন্ধ্যা হয়।

নদীতীরে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফিরে এলো তারা কুঠিরে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তখনও ফিরে আসেননি সন্ন্যাসী বাবাজী।
চিন্তিত হলো সবাই।
কেশবের চোখ অশ্রু ছলছল হলো।
নূরীর অবস্থাও তাই। সন্ন্যাসী বাবাজী তাদের পিতার মত।
রাত বেড়ে চললো।
বনহুর, কেশব আর নূরীর মুখ অন্ধকার হলো। সবাই উঠানে বসে প্রতীক্ষা করছে।
রাত যত বাড়ছে ততই সকলের মনে আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হয়ে আসছে—এমন তো কোনোদিন হয় না।
কেশব আর নূরী প্রায় কেঁদেই ফেললো।
ছোট্টবেলা হতে কেশব সন্ন্যাসী বাবাজীর কাছেই মানুষ।
তাই সন্ন্যাসী বাবাজীর জন্য তার সবচেয়ে বেশি অস্থিরতা।
দেখতে দেখতে রাত শেষ হয়ে এলো।
সন্ন্যাসী বাবাজী আর ফিরে এলেন না।
ভোর হতেই কেশব ধরে বসলো সে শহরে যাবে। সন্ন্যাসী বাবাজী কেন ফিরলেন না তাঁকে খুঁজে আনবে।
বনহুর বললো—এতো ব্যস্ত হলে চলবে না। তুমি বরং থাকো আমি গিয়ে তাঁর অন্বেষণ করে আসি।
আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। বললো কেশব।
বনহুর বললো—তা হয় না। নূরী একা থাকবে?
কেন, আমাকেও নিয়ে চলো না হুর! আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।
পাগল হলে—তোমরা দু'জনার কেউ নয়। দিল্লী শহর অনেক দূরে।
বনহুর সাধারণ সন্ন্যাসীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো। তার দেহে গেরুয়া কাপড়, ললাটে চন্দনের তিলক আর হাতে-গলায়-বাজুতে রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সুন্দর সুপুরুষ এক সন্ন্যাস যুবকের বেশে বনহুর কেশব আর নূরীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।
নূরী দীপ্তভরা উজ্জ্বল চোখে তাকালো, বললো—শীগ্গির ফিরে এসো।
কেশব বললো—বাবু, তোমাকে ঠিক্ সন্ন্যাসী বলেই মনে হচ্ছে। যাও বাবাজীকে নিয়ে ফিরে এসো।
বনহুর চলে গেলো।
কেশব, আর নূরী রইলো এখানে। আজ ওরা নতুন নয়, এমনি কতদিন কেশব আর নূরীর কেটেছে।
শহরে পৌঁছিতে বনহুরের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।
এতোটা পথ তাকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। শহরে পৌঁছেও তাকে পায়ে হেঁটে পথে পথে ঘুরতে হচ্ছে।
শহরের বিজলী বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে পট্ পট্ করে। দোকান-পাট, রেষ্টুরেন্ট আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে।

মোটরগুলোর সার্চলাইট তীব্র আলো ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে সেদিকে। পিছনের লাল আলোগুলো যেন রাক্ষসের দুটো চোখের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

বনহুর রাজপথের পাশে এসে দাঁড়ালো।

দিল্লীর ফাহারা রোড এটা। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে দিল্লী। রাজধানী বা আসল শহর।

বনহুর এতোবড় শহরে কোথায় খুঁজবে সন্ন্যাসী বাবাজীকে। কেশব আর নূরীর জন্যই না সে বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়েছে। পকেট পয়সাশূন্য। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। অনেক পথ হাঁটার জন্য দেহটাও শিথিল হয়ে এসেছে। বনহুর একটা লাইট পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা কাপড়ের টুকরা বের করে মুখ মুছে নিলো, রুমাল নেই—এ কাপড়ের টুকরাটাই এখন রুমাল। এমন কোনো সম্বল নেই যা দিয়ে বনহুর ক্ষুধা নিবৃত্ত করে বা করতে পারে।

বিখ্যাত দস্যু সর্দার আজ সম্বলহীন।

ছ'মাস সে গহন জঙ্গলে সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করে হয়ে উঠেছে ঠিক্ সন্ন্যাসীর মতই। সিগারেটের নেশা ছিলো যার চরম আকারে, আজ সব নেশা তার ছুটে গেছে।

বনহুর চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বিশ্রামের আশায় বসে পড়লো।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামলো তার অদূরে। একটি তরুণ আর একটি তরুণী নেমে এলো গাড়ি থেকে। বাঙালী বলেই মনে হলো বনহুরের প্রথম নজরে।

বনহুর দেখলো ওরা ঠিক্ তার দিকেই আসছে।

চোখ বন্ধ করে বনহুর বসে রইলো, মাঝে মাঝে মৃদু দৃষ্টি মেলে দেখছে। হাঁ, ওরা তার দিকেই আসছে।

বনহুর বিড় বিড় করে মন্ত্রজপের মত কিছু উচ্চারণ করতে লাগলো।

যুবক আর যুবতী এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে। যুবক বললো—সন্ন্যাসী বাবা! সন্ন্যাসী বাবা!

চোখ মেলে তাকালো বনহুর, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কে ডাকে?

বললো এবার তরুণী—বাবাজী দয়া করুন। দয়া করুন আমাদের!

তরুণ বললো—আমরা বড় বিপদে পড়েছি বাবা।

বললো বনহুর—আমি জানি তোমরা কি বিপদে পড়েছো।

ব্যাকুল কণ্ঠে বললো তরুণী—বাবাজী, আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

বসো। বসো তোমরা।

বসে পড়লো তরুণ এবং তরুণী।

বনহুর বললো—দেখি হাত। তরুণের দিকে হাত বাড়ালো সে।

হাতখানা মেলে ধরলো তরুণ বনহুরের দিকে।

বনহুর ওর হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—বৎস, তোমাদের বিপদ আরও ঘনীভূত আমি দেখতে পাচ্ছি।

তরুণী প্রায় কেঁদে ফেললো, বললো সে—কি করে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো বলুন বাবাজী? কি করে আমরা ভাইবোন দুষ্ট কুচক্রী কাকার কবল থেকে রক্ষা পাবো বলুন?

বনহুর আন্দাজে বলছিলো সব, আসলে সে জপ-তপ আর মন্ত্র কিচ্ছু জানে না। এবার সে অনেকটা বুঝতে পারলো—এরা তাদের কাকার কবল থেকে উদ্ধার পেতে চায়। ভাগ্যিস বলে বসেনি সে—তোমাদের বিয়ে হবে, কোনো চিন্তা নেই। যাক্, এবার বনহুর আঁচ করে নিয়েছে—ওরা দু'জন ভাই আর বোন। বললো বনহুর—বৎস, তোমাদের কাকার কবল থেকে বাঁচতে পারো, যদি এক কাজ করো।

বলুন বাবাজী, আমরা বাঁচতে চাই। যা বলবেন তাই করবো।

পারবে! তোমার কাকাকে আমার নিকটে আনতে পারবে?

চমকে উঠে তরুণ-তরুণী। বলে তরুণ—আমার কাকা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানুষ। তিনি আমাদের হত্যা করার চেষ্টায় আছেন। আজ রাতে আমাদের হত্যা করবেন।

কি করে এ কথা তোমরা জানলে?

আমার কাকা একটা লোকের সঙ্গে গোপনে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমার বাবার বিষয়-আসয় যাতে আমার কাকার নিজস্ব হয়, এই তার চেষ্টা।

আমি সব অবগত হয়েছি।

আমাদের বাবা-মা জীবিত নেই, এবং সেই কারণেই আমার দুষ্ট কাকা আমাদের হত্যার চেষ্টা করছেন। আমরা যদি না থাকি তাহলে আমার কাকা নিশ্চিন্ত মনে বাবার এবং কাকার উভয়ের ঐশ্বর্য একাই ভোগ করবেন।

বুঝলাম বৎস। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাদের কাকা পারবে না তোমাদের হত্যা করতে।

তরুণ-তরুণী বনহুরের পায়ের উপর উবু হয়ে পড়লো। বাঁচার জন্য সে কি আকুতি!

বনহুরের মন মায়ায় আদ্র হয়ে উঠলো! বললো সে—বৎস, কোনো চিন্তা করো না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি তোমাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবো।

পারবেন আপনি আমাদের রক্ষা করতে?

হ্যাঁ বৎস।

তাহলে কি উপায়ে আপনি রক্ষা করবেন বাবাজী? বললো যুবক।

যুবতীও প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সন্ন্যাসীবেশী বনহুরের মুখে।

যুবক-যুবতীর দেহের পোশাক-পরিচ্ছদে বুঝতে পারলো বনহুর—ওরা সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হবে। যুবকের বয়স কুড়ির বেশি নয়। যুবতী ষোল-সতেরো হবে। সুশ্রী চেহারা উভয়ের।

বনহুর বললো—আমার আদেশ—তোমরা ফিরে যাও।
শিউরে উঠলো যেন উভয়ে।
বনহুর বললো—ভয় নেই, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।
তরুণ-তরুণীর মুখ যেন খুশীতে উজ্জ্বল হলো। বললো তরুণ—বাবাজী, আপনি দয়া করে চলুন আমাদের সঙ্গে।
বললো বনহুর—যাবো, কিন্তু গোপনে। তোমাদের বাড়ির একটি প্রাণীও যেন জানতে না পারে সন্ন্যাসী বাবাজী এসেছেন।
না, পারবে না। আসুন, আমাদের সঙ্গে চলুন।
চলো বৎস। বনহুর গাড়ির পিছন আসনে চেপে বসলো।
তরুণটি ড্রাইভিং আসনে বসলো আর তরুণী বসলো তার পাশে!
বনহুর বললো—বাড়ির পিছন দিকে দিয়ে যাবে। তোমার কাকা যেন টের না পায় তোমরা বাইরে গিয়েছিলে। আর শোন, আমি শুধু তোমাদের বাড়ির নিকটে যাবে—বাড়িতে নয়!
তাহলে আমাদের রক্ষা করবেন না? বাঁচাবেন না আমাদের কাকার কবল থেকে।
হাঁ বৎস, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। প্রতিদিনের মত আজও তোমরা নিজ বিছানায় শোবে! যেন তোমরা কিছু জানোনা।
কিন্তু......
কোনো কিন্তু নেই। আমি যেভাবে বললাম ঐভাবে কাজ করবে।
তরুণটি মোটর ষ্টার্ট দিলো। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।
বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গ্র্যাণ্ড রোডের অদূরে একটা বিরাট বাড়ির পিছনে এসে গাড়ি থেমে পড়লো।
তরুণ বললো—গুরুদেব, এটাই আমাদের বাড়ি। আমার বাবা-মা মারা যাবার পর আমরা এ বাড়িতেই থাকি। আর থাকেন আমার কাকা।
বনহুর নেমে গেলো অন্ধকারে।
তরুণ গাড়ি নিয়ে চলে গেলো।
বনহুর সন্ন্যাসী বাবাজীর বেশে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ালো। গেটের পাশে নেমপ্লেটে নামটা পড়ে নিলো বনহুর—রাজনারায়ণ। আপন মনেই উচ্চারণ করলো বনহুর— অদ্ভুত নাম-রাজনারায়ণ।
সন্ন্যাসী দেখে এগিয়ে এলো দারওয়ান, প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলো— গুরুবাবা, কোন্ চিজ মাঙ্গতা----
বনহুর বললো— হর হর শিবও শঙ্করও--- একটু থেমে বললো— রাজনারায়ণের সাক্ষাৎ কামনায় এসেছি।
আপ্ থোরা রহিয়ে গুরু বাবা, হাম্ আভি মালিক সে বাত পুছকে আতা হ্যায়।
বনহুর জোরে জোরে উচ্চারণ করলো— হর হর শিবও শঙ্করও--- হর হর শিবও শঙ্করও---

অল্পক্ষণ পরে ফিরে আসে দারওয়ান—আইয়ে গুরুবাবা।
গেট খুলে দিলো।
বনহুর অনুসরণ করলো দারওয়ানকে।
মস্তবড় বাড়ী।
রাজা-মহারাজার বাড়ীর মতই পর পর কয়েকটা ফটক পেরিয়ে মস্তবড় হলঘর। বনহুর হলঘরে প্রবেশ করতেই দারওয়ান কুর্ণিশ জানালো—সম্মুখের আসনে বসে আছ রাজনারায়ণ।
বনহুর তাকালো রাজনারায়ণের মুখে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। কোথায় রাজনারায়ণ—এ যে গুলেশান হোটেলের মালিক মাহমুদ রিজভী! এখন তার মুখে আগলা দাড়ি-গোঁফ নেই। পায়জামা-আচ্‌কানও নেই। সম্পূর্ণ হিন্দু ড্রেস তার শরীরে।
বনহুর হকচকিয়ে গেলেও ভড়কে যাবার বান্দা সে নয়। চট্ করে নিজকে সামলে নিলো। গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—হর হর শিবও শঙ্করও....হর হর শিবও শঙ্কর.......
হাতে তার চিম্‌টা আর রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। বনহুরের মুখে আলগা দাঁড়ি-গোঁফ। এক গাদা দাঁড়ি-গোফের মধ্যে সুন্দর দীপ্তময় দুটি আঁখি। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে আঁখি দু'টিতে।
বনহুর মাহমুদ রিজভীকে চিনতে পারলো কিন্তু মাহমুদ রিজভীর সাধ্য নেই সে বনহুরকে চিনতে পারে। তাছাড়া মাহমুদ রিজভী জানে, মিঃ আলমবেশী দস্যু বনহুর আর লুসীর গভীর নদীবক্ষে মৃত্যু ঘটেছে। ভাবতেও পারবে না সে—মিঃ আলমের মৃত্যু হয়নি—সে আজ তার সম্মুখে।
সন্ন্যাসী বাবাকে দেখে উঠে দাঁড়ায় রাজনারায়ণবেশী মাহমুদ রিজভী। দু'হাত জুড়ে অভিবাদন করে, তারপর বলে—বসুন সন্ন্যাসী বাবাজী।
বনহুর আসন গ্রহণ করে।
মাহমুদ রিজভী বলে এবার—বাবাজী, হঠাৎ কি মনে করে এসেছেন জানতে পারি কি?
হাঁ বৎস, সব জানতে পারবে এবার।
বলুন বাবাজী?
বৎস, আমি যোগ সাধনায় বসে জানতে পারলাম, এ শহরে রাজনারায়ণ নামক ব্যক্তি অচিরেই রাজ ঐশ্বর্য লাভে লাভবান হবেন। কিন্তু পথে দুটি কাঁটা আছে। ঐ কাঁটা দুটি যতক্ষণ উপড়ে ফেলা না যাবে, ততক্ষণ ঐ রাজ ঐশ্বর্য লাভ হলেও স্থায়ী হবে না। আমি তাই অনেক সন্ধান নিয়ে তবে তোমার নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি। আমার এই প্রচেষ্টায় তোমার যদি রাজ ঐশ্বর্য লাভ হয় তবে আমি ধন্য হবো।
খুসীতে মাহমুদ রিজভীর চোখ দুটো জ্বলে উঠে, বলে সে—বাবাজী, আপনার সেবা করতে পারলে ধন্য হবো। বহুদূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত।

হাঁ বৎস, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।
মাহমুদ রিজভী কলিং বেলে চাপ দিলো।
সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো একটি বয়। ছালাম করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।
রিজভী বললো—সন্ন্যাসী বাবাজীর খাবার জন্য দুধ, আর কিছু ফলমূল নিয়ে এসো।
চলে গেলো বয়।
রিজভী আগ্রহভরে এগিয়ে এসে বসলো বনহুরের পাশের আসনে। বললো—বাবাজী, আপনি যোগ সাধনায় যা দেখেছেন তা সত্য। রাজ ঐশ্বর্য আমার হাতের মুঠায়, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত নই। আমার পথে দুটো কাঁটা আছে।
হাঁ, আমি জানি।
বাবাজী, আমি আজ রাতে ঐ কাঁটা দুটোকে শেষ করে ফেলবো মনস্থ করেছি। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে নেয়—ঐ কাঁটা দুটো হলো.....থামলো রিজভী।
বনহুর বলে উঠলো—আমি জানি তারা কে? তোমার মৃত ভাই-এর পুত্র এবং কন্যা।
হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন বাবাজী। রিজভীর বিশ্বাস আরও গাঢ় হয়।
বলে আমার বনহুর—কিন্তু বৎস, তুমি যে ভাবে ওদের হত্যা করতে মনস্থ করেছো তাতে অসুবিধা আছে।
তাহলে উপায় বলে দিন বাবাজী? আমি সেভাবেই ওদের খতম করবো।
ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে বৎস। বেশি উতালায় সব পণ্ড হতে পারে।
এমন সময় বয় ট্রের উপরে নানারকম ফল এবং এক গেলাস খাঁটি দুধ নিয়ে আসে।
রিজভী নিজের হাতে বনহুরের সম্মুখে ফলমূল আর দুধের গেলাস সাজিয়ে রাখে, তারপর বলে—ভক্ষণ করুন বাবাজী।
বনহুর ক্ষুধার্ত ছিলো, কোনোরকম আপত্তি না করে পেট পূর্ণ করে খেয়ে নেয়।
ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার পর সে বলে— বৎস, এবার আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।
মাহমুদ রিজভী কিছু চিন্তা করলো, তারপর বললো—বাবাজী, একটি কথা আমাকে বলে আপনি বিশ্রাম করুন।
বলো বৎস?
আজ আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মহেন ও ভ্রাতুষ্পুত্রী মোহিনীকে শেষ করবো মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু.....
বলো বৎস, আমার কাছে সঙ্কোচের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার প্রধান অনুচর জব্রু এদের দু'জনাকে গলা টিপে হত্যা করবে, তারপর জব্রু মৃতদেহ দুটিকে যমুনাবক্ষে ফেলে দিয়ে আসবে। কেউ জানবে না ওরা কোথায় গেছে।

শুভাংশু....শুভাংশু....জয় জয় হর হর শিবও শঙ্করও...সব ঠিক্ আছে।

তাহলে এভাবেই কাজ করবো?

হাঁ, কিন্তু এতো ব্যস্ত হলে কার্য সফল নাও হতে পারে।

তাহলে বলে দিন বাবাজী?

সব বলছি, সেভাবে কাজ করবে।

শয়তান মাহমুদ রিজভী সন্ন্যাসীবেশী দস্যু বনহুরকে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করে নিলো। বললো রিজভী—বলুন আমি কিভাবে কাজ করতে পারি?

বলছি বৎস, বলছি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী কি শিশু? বনহুর নিজেকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিবেচিত করার জন্য প্রশ্ন করলো।

রিজভী বললো—না, তারা পূর্ণবয়স্ক।

হোক, তাতে ক্ষতি নেই।

বলুন কিভাবে কার্য করা যাবে বা যেতে পারে—বলুন সন্ন্যাসী বাবাজী?

বললো বনহুর—এক কাজ করলে সবচেয়ে মঙ্গল হয়। গভীর রাতে কোনো এক জায়গায় যাওয়ার নাম করে সোজা তাদের নিয়ে যেতে হবে গহন জঙ্গলে, ঠিক্ যমুনার তীরে—তারপর...দু'জনাকে নিঃশেষ করে ফেলে দিবে যমুনাবক্ষে। কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না কোথায় গেলো ওরা। শুধু আমি চাই তাদের রক্ত....হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে উঠে বনহুর।

রিজভী সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো মাথায় নেয়। করজোড়ে বলে—বাবাজী আপনি যদি সহায় হন, কার্য যদি সিদ্ধি হয় তবে আমি আপনাকে শুধু রক্তই দেবো না, দেবো অজস্র অর্থ—প্রচুর ঐশ্বর্য।

হর হর শিবও শঙ্করও—অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই আমার, শুধু চাই ওদের রক্ত, রক্ত পেলেই আমার চলবে।

বলুন কি ভাবে কাজ করবো?

আজ রাতেই তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।

বাবাজী, আপনি সঙ্গে থাকবেন আমার?

হাঁ, আমি সঙ্গে থাকবো। হর হর শিব ও শঙ্কর ও শিবও শঙ্করও.....

জব্রুকে নেবো?

হাঁ, তাকে নিতেই হবে, কারণ তার হস্তেই কাঁটা দুটোকে উপড়ে ফেলতে হবে।

হাতঘড়ি দেখে রিজভী—সন্ন্যাসী বাবাজী, রাত এখন দশটা বেজে গেছে।

রাত দুটোয় আমাদের রওয়ানা দিতে হবে। বললো সন্ন্যাসীবেশী বনহুর। তারপর আবার বললো—সে—আমি যাই, ঠিক্ সময় পৌঁছে যাবো।

কিন্তু অতোরাতে আপনি যদি ঠিক্‌ভাবে এসে না পৌঁছান, তাহলে?

আমার জন্য কোনোরকম ভাবনা ভাবতে হবে না। দু'ই-দুটো লোকের রক্তের নেশা কম নয়। উঠে দাঁড়ায় বনহুর।
রিজভী পদধূলি গ্রহণ করে।
সন্ন্যাসীবেশী বনহুর হাত তুলে আশীর্বাদ জানায়।
বেরিয়ে যায় সন্ন্যাসীবেশী বনহুর।

❑

বনহুর সন্ন্যাসীর বেশে, সন্ন্যাসী বাবাজীকে খুঁজতে শহরে চলে গেলো। কেশব আর নূরী রইলো জঙ্গলের কুঠিরে।
এদিকে বনহুর চলে যেতেই সন্ন্যাসী বাবাজী এসে হাজির হলেন। শহরে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তিনি ফিরতে পারেননি—গত রাত্রি তাই তিনি শহরে কাটিয়েছিলেন। আশ্রমে পৌঁছে তিনি যখন শুনলেন, বাবুজী তার খোঁজে চলে গেছে শহরে, তখন সন্ন্যাসী বাবার মুখ গম্ভীর হলো। কারণ শহর এ জঙ্গল ছেড়ে বহু দূরের পথ। এতো দূর সে যাবে কি করে, তারপর কোথায় তাকে খুঁজে ফিরবে!
কেশব আর নূরী সন্ন্যাসী বাবাজীর সঙ্গে চিন্তিত হয়ে পড়লো। এখন বনহুরকে ফিরিয়ে আনার উপায় কি!
বিশেষ করে এসব জায়গা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।
এখানে যখন সন্ন্যাসী বাবাজী, কেশব আর নূরী বনহুরকে নিয়ে চিন্তায় অস্থির তখন বনহুর রাজা নারায়ণবেশী মাহমুদ রিজভীকে শায়েস্তা করার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছিলো। বনহুর জানে, সন্ন্যাসী বাবাজী ছোট্ট বাচ্চা শিশু নন যে, হারিয়ে যাবেন, তিনি শহরের কোথাও আছেন তাঁকে খুঁজে এখন কোনো ফল হবে না; ভাগ্যক্রমে শয়তান রিজভীর সাক্ষাৎলাভ যখন ঘটেছে তখন তাকে তার কর্মফলের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে স্বস্তি নেই বনহুরের।
রিজভীকে আজ এভাবে না পেলেও বনহুর যে তাকে ছেড়ে দেবার লোক নয় বা দিতো না এটা সুনিশ্চয়। রিজভী শুধু তাকেই শাস্তি দান করেনি—লুসীকে হত্যা করেছে। তার অমূল্য সতীত্ব বিনষ্ট করেছে সে। বনহুরের শিরায় শিরায় যে বহ্নিশিখার মত সে আগুন জ্বলছে। এতো সহজে বনহুর রিজভীকে যে হাতের মুঠায় পাবে ভাবতে পারেনি। বনহুর খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করে নেয়।
বনহুর এসে দাঁড়ায় রাজ নারায়ণের কক্ষের পিছনে। সমস্ত বাড়িখানা সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। হয়তো রাজনারায়ণ তার কার্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বনহুর পিছনের পাইপ বেয়ে তর তর করে উঠে গেলো উপরে। রেলিং টপ্‌কে বেলকুনিতে এসে নামলো। ওদিকের দরজা খুলে উঁকি দিলো ভিতরে, কক্ষ খালি—কেউ নেই। বনহুর দ্রুত প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। এ কক্ষটিই যে রাজনারায়ণের শয়নকক্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনারায়ণবেশী রিজভী কোথায়। এমন সময় কানে ভেসে এলো ওদিকের কোনো এক কামরা থেকে রিজভীর কণ্ঠ স্বর—স্বপন, কল্পনা, তোমরা তৈরি হয়ে নাও, এক জায়গায় তোমাদের যেতে হবে। রাত দুটোয় রওয়ানা দেবেন।

সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, তরুণের গলা শোনা গেলো—কাকা, এতো রাতে আমাদের আপনি কোথায় নিয়ে যাবেন?

বনহুর বুঝতে পারলো, শয়তান রিজভী ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তৈরি করে নিচ্ছে। ওদের নাম স্বপন আর কল্পনা এ কথাও বনহুরের জানা হয়ে গেলো।

ওদিকে যখন রিজভী নিঃসন্দেহে স্বপন আর কল্পনাকে বুঝিয়ে বাগে এনে নিচ্ছিলো, তখন বনহুর দ্রুত হস্তে তার কাজ সমাধা করে নিলো। বালিশ তুলে দেখলো, তারপর আল্‌নায় ঝোলানো কোটের পকেট হাতড়ে পেলো চাবীর গোছা। চাবী দিয়ে খুলে ফেললো লৌহ্ আলমারী,ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিভলভারখানা পকেটে রাখলো। পকেটে রাখবার পূর্বে দেখে নিলো তাতে গুলী মজুত আছে কিনা। বনহুর জানে, শয়তানের রিভলভার কোনো দিন শূন্য থাকার নয়। গুলীভরা রিভলভার পকেটে রেখে টাকার কয়েকটা বাণ্ডিল উঠিয়ে নিলো। তারপর বেরিয়ে গেলো কক্ষ হতে।

একটু পরে ফিরে এলো রিজভী তার কক্ষে। বেশ নিশ্চিন্ত সে, কারণ স্বপন আর কল্পনা তার কথায় রাজী হয়েছে।

কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলো—লৌহ আলমারী খোলা পড়ে রয়েছে। তবে কি কেউ তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো? কিন্তু কি করে তা সম্ভব! সমস্ত বাড়ি মজবুত প্রাচীরে ঘেরাও রয়েছে। সিঁড়ির মুখে দরজায় তালা বন্ধ, তাছাড়াও গেটের পাশে সজাগ পাহারা দিচ্ছে পাহারাদার। সিঁড়ির মুখে খুপড়ীতে ঘুমাচ্ছে জব্রু। কারো সাধ্য নেই তার কক্ষে প্রবেশ করে।

আজ দশ বছর হলো এ বাড়িতে আছে রিজভী। এ বাড়ি আসলে তার নয়, তার বড় ভাই শ্যামনারায়ণের বাড়ি এটা। রাজনারায়ণ হলো তার নাম। বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে রাজনারায়ণ যখন দিল্লী তার বড় ভাই-এর বাড়ি এসে হাজির হলো তখন সে দীনহীন ভিখারীর চেয়েও কাঙাল। এক পয়সা তার সম্বল ছিলো না, ছিন্নভিন্ন তার জামা-কাপড়।

ছোটবেলা থেকেই রাজনারায়ণ ছিলো ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির। নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো পূর্ব হতেই। শ্যামনারায়ণ ছিলেন তেমনি মহৎপ্রাণ লোক। ছোট ভাই-এর এতো দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন তিনি।

কিন্তু রাজনারায়ণ বড় ভাইকে মোটেই ভক্তি করতো না বরং কিসে বড় ভাই-এর অমঙ্গল করতে পারবে সেই চেষ্টা করতো সে। একদিন ভীষণ এক মন্দ কাজ করে বসে রাজনারায়ণ। তখন শ্যামনারায়ণ তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন।

রাজনারায়ণ চলে যায় বটে কিন্তু সে সবসময় বড় ভাইকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করে।

ফিরে আসে অনেক দিন পরে দিল্লীতে বড় ভাই-এর বাড়িতে।

ক্ষমাশীল শ্যাম নারায়ণের রাগ তখন পড়ে এসেছিলো, তিনি ছোট ভাইকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজ বাড়িতে।

তিনি সেদিন জানতেন না তার সহোদয় তাঁকে চরমভাবে শাস্তি দেবে। উপরে সাধু সেজে নীচে নীচে জঘন্য কাজে লিপ্ত হলো রাজনারায়ণ। জব্রুকে সে নিজের আয়ত্তে এনে নিলো কৌশলে।

তারপর একদিন শ্যামনারায়ণকে জব্রুর দ্বারা হত্যা করলো রাজনারায়ণ, বৌদিও বাদ গেলো না।

একদিন রাতে স্বামীশোকে কাতর বৌদি কচি দুটি বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছেন নিজের শয়নকক্ষে। এমন সময় তার কক্ষে প্রবেশ করে রাজনারায়ণ, তার পিছনে জমকালো ভূতের মত নিগ্রো শয়তান—জব্রু।

জব্রুকে দেখে শিউরে উঠেছিলো বৌদি—এতো রাত্রে তার কক্ষে সে কেন। কিন্তু রাজনারায়ণকে দেখে বুকে সাহস হয়েছিলো, পরক্ষণেই তার মুখে দৃষ্টি পড়তেই বৌদির দেহের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিলো। রাজনারায়ণের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

করুণ কণ্ঠে বলেছিলো বৌদি—ঠাকুরপো, এতো রাত্রে তোমরা আমার ঘরে কেন?

রাজনারায়ণ দাঁতে-দাঁত পিষে বলেছিলো—-একটু পরেই টের পাবে কেন এসেছি আমরা। পরক্ষণেই রাজনারায়ণ জব্রুর দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে জব্রু তার লৌহসবল হাত দু'খানা বাড়িয়ে চেপে ধরেছিলো বৌদির গলা। একটু-টু শব্দ বের হয়নি তার কণ্ঠ দিয়ে।

পরদিন স্বপন আর কল্পনা তাদের শয্যায় মাকে মৃত অবস্থায় দেখেছিলো।

কচি শিশু তখন স্বপন আর কল্পনা। ওরা জানে না, কি করে তাদের মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

শয়তান রাজনারায়ণ বড় ভাই এবং বৌদিকে সরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হলো না। কিন্তু চট করে কচি দুটি শিশুকে হত্যা করতেও সাহসী হলো না সে। ভাবলো ওদের হত্যা করতে আর কতক্ষণ। এখন তো আর তার কাজে বাধা দেয়ার নেউ নেই। যা খুসী সে করে যাবে। এ বাড়ি-ঘর ঐশ্বর্য সব এখন তার। বাচ্চা দুটি তো চুনের ফোঁটা। জব্রুর নখের টিপ

দিলেই ওরা চলে যাবে পরপারে। কাজেই বাচ্চা দুটোর জন্য আর বেশি ভাবতে হবে না।

রাজনারায়ণ দাদা শ্যামনারায়ণের গদি দখল করে নিয়ে জেঁকে বসলো। এখন সে পূর্বের সেই দীনহীন রাজনারায়ণ নয়। এখন সে রাজ-রাজেশ্বর, কোটি টাকার মালিক রাজনারায়ণ। সে গোপনে দিল্লীর বুকে নানারকম কুকর্ম শুরু করলো। মুসলমান নাম ধারণ করে গুলশান হোটেলের ম্যানেজার সেজে চালালো তার নানারকম মন্দ ব্যবসা। জব্রু হলো তার দক্ষিণ হস্ত। জব্রুকে দিয়ে সে রাতে শহরে নানা রকম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে চললো। জব্রুকে কেউ যেন নিহত করতে না পারে সেজন্য তার দেহে লৌহ বর্ম পরিয়ে দিতো রাজনারায়ণ।

গভীর রাতে রাজনারায়ণ তার ভূগর্ভের আস্তানায় যেতো এবং জব্রু তখন বিচরণ করতো রাতের ভয়ঙ্করের মত পৃথিরাজের রাজপ্রসাদের আনাচে-কানাচে। কারণ পৃথিরাজের শিব মন্দিরেই ছিলো রাজনারায়ণবেশি রিজভীর আস্তানার সুড়ঙ্গ মুখের গোপন দ্বার।

রাজনারায়ণ পরম নিশ্চিন্তে তার কার্য সাধন করে চললেও মনে তার কাঁটার খোঁচা ছিলো, যতক্ষণ স্বপন আর কল্পনাকে তার পথ থেকে সরাতে না পেরেছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে ওরা, পিতামাতা সম্বন্ধে তাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। পিতার ঐশ্বর্যের প্রতি আসছে মোহ, কাজেই আর বিলম্ব নয়।

এবার পথের কাঁটা উপড়ে ফেলতেই হবে।

খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে রাজনারায়ণ। রিভলভার খুঁজে না পেয়ে বের করলো তার সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা। আংগুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে রাজনারায়ণ বার বার।

রাত দুটো প্রায় বাজতে চলেছে। সন্ন্যাসীর জন্য প্রতীক্ষা করছে সে।

জব্রুও জেগে উঠে সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। জব্রুর হাত দু'খানাই হলো লৌহ সাঁড়াশী। এ হাত দু'খানা দিয়ে সে যা খুসী তাই করতে পারে। শুধু রাজনারায়ণ রিজভীর সামান্য ইঙ্গিত মাত্র।

জব্রুর দেহে লৌহ বর্ম পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

রাজনারায়ণের পাশে নিদ্রাজড়িত চোখে দাঁড়িয়ে আছে স্বপন আর কল্পনা। মুখ তাদের বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কই, সন্ন্যাসী বাবা তো তাদের বাঁচাতে এলেন না। তবে কি সব ফাঁকি? সন্ন্যাসী বাবাও কি তাদের সঙ্গে ছলনা করেছে!

প্রথমে স্বপন আর কল্পনা কিছুতেই রাজী হয়নি তাদের কাকার সঙ্গে যেতে। কিন্তু রাজনারায়ণ যখন তাদের ভীষণভাবে শাসন করেছিলো তখন রাজী না হয়ে কোনো উপায় ছিলো না। ভেবেছিলো, একদিন যখন মরতে হবে তখন মরবে তারা। দু'ভাই বোন সানন্দে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী এসে হাজির হলো।

রাজনারায়ণের চোখ দুটো খুসীতে ভরে উঠলো।

তেমনি খুসী হলো স্বপন আর কল্পনা। মনে তাদের সাহস হলো সন্ন্যাসী বাবাজী এসেছে, আর হয়তো তাদের যেতে হবে না। হয়তো এবার তিনি রক্ষা করবেন তাদের দু'জনকে।

কিন্তু একি, সন্ন্যাসী বাবাজী তাদের হয়ে দুটো কথাও বললেন না। বরং তাদের যেন দেখেননি কোনোদিন, এমনি ভাব দেখাচ্ছেন। কিন্তু তিনি যদি তাদের মঙ্গলের জন্যই না আসবেন তবে এতো রাতে কি করতে এসেছেন এখানে। তবে কি তাদের কাকার সঙ্গে তারও যোগ আছে। শিউরে উঠলো ওরা-হয়তো তাই হবে, নাহলে.....

একটা লোক এসে বললো—গাড়ি প্রস্তুত মালিক।

রাজনারায়ণ এবার সন্ন্যাসী বাবাজীসহ অগ্রসর হলো। তাদের পিছনে স্বপন আর কল্পনা এলো।

জব্রুও আছে সকলের পিছনে।

জব্রু স্বপন আর কল্পনার অপরিচিত নয়। আরও কত দিন ওর সঙ্গে বেড়াতে গেছে ওরা। তবু আজ এতো রাতে জব্রুকে তাদের সঙ্গে যেতে দেখে কেমন সন্দেহ জাগলো তাদের মনে।

স্বপন আর কল্পনার মুখে কোনো কথা নেই।

মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপছে ওরা।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতায় পথ থম থম করছে। ট্রাফিক পুলিশ নেই, কিন্তু ট্রাফিক আলোগুলো পথের বাঁকে নিয়মিত কাজ করে চলেছে।

ট্রাফিক আলো তার রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে গাড়িখানাকে ক্ষান্ত হবার জন্য নির্দেশ দিলো কিন্তু খুনের নেশায় উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে রাজনারায়ণ, ট্রাফিক আলোর রক্তচক্ষুর ভয়ে সে ক্ষান্ত হলো না। তার গাড়িখানা তীব্রগতিতে চলে গেলো পার হয়ে।

ড্রাইভিং আসনে রাজনারায়ণ স্বয়ং উপবেশন করেছে। নিজে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

তার পাশে বসে সন্ন্যাসী বাবাজী।

পিছন আসনে জব্রু আর স্বপন ও কল্পনা।

স্বপন আর কল্পনা বলির পশুর মত যেন কুকঁড়ে গেছে, বিশেষ করে কল্পনা নীড়হারা পাখির মত ভাইকে আঁকড়ে ধরে কাঁপছে।

শহর ছেড়ে নির্জন পথে গাড়ি ছুটছে এখন।

দুই ধারে গহন বন।

ভয়ে শিউরে উঠে স্বপন আর কল্পনা।

কল্পনা বলে উঠে—কাকা, আমাদের আপনি কোথায় নিয়ে চলেছেন? ড্রাইভ আসন থেকে বলে রাজনারায়ণ—নিরাপদ স্থানে। ভয় নেই চুপচাপ বসে থাকো।

সন্ন্যাসী বাবাজী মাঝে মাঝে উচ্চারণ করছিলো হর হর শিবও শঙ্করও...হর হর শিবও শঙ্কর.....

ক্রমেই এমন পথে গাড়ি এসে পড়েলো, যে পথে আলোর কোন সন্ধান নেই।

সন্ন্যাসীবেশী বনহুর তার চোরা পকেটে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

এবার স্বপন আর কল্পনার সন্দেহ সত্য বলে মনে হলো। সন্ন্যাসীও যে তার কাকার লোক তাতে কোনো ভুল নেই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো তারা।

রাজনারায়ণ জীপগাড়ি অসমান বনভূমির মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে। দু ধারে গহন জঙ্গল, গাড়ির সার্চলাইটের আলোতে পথের পাশে বন্য জন্তুগুলো ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

বনহুর আপন মনে হাসছে।

রাজনারায়ণের মনে আজ খুনের নেশা। এদের দু'জনকে হত্যা করতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। আর কেউ থাকবে না তার পথে বাধা হিসেবে। সন্ন্যাসী বাবাও তার পরম হিতৈষী। তার কথা-মতই স্বপন আর কল্পনাকে নিয়ে চলেছে সে গহন বনের মধ্যে, হত্যা করে ভাসিয়ে দেবে ওদের মৃতদেহ যমুনা নদীবক্ষে। তারপর আপদ চুকে যাবে। সন্ন্যাসী বাবার শুধু চাই কুমার এবং কুমারীর তাজা রক্ত।

এক সময় রাজনারায়ণের গন্তব্য স্থানে তারা পৌঁছে যায়।

গাড়ি রেখে নেমে পড়লো রাজনারায়ণ। দরজা খুলে ধরে অনুনয়ের সুরে বললো—আসুন গুরু বাবাজী!

সন্ন্যাসীবেশী দস্যু বনহুর নেমে দাঁড়ালো—হর হর শিবও শঙ্করও!

জব্রুও নামলো গাড়ি থেকে।

অসহায়ের মত কাঁপছিলো স্বপন আর কল্পনা।

রাজনারায়ণ বললো এবার—নেমে এসো তোমরা দু'জনা।

কল্পনা স্বপনের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরলো—না, আমরা নামবো না। আপনি আমাদের এ কোথায় নিয়ে এলেন বলুন?

কঠিন কণ্ঠে বললো রাজনারায়ণ—নেমে এসো তোমরা।

স্বপন এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমাদের আপনি হত্যা করবেন জানি। তা বাড়িতেই করলে পারতেন?

নেমে এসো, কথা বাড়িও না বলছি। বললো রাজনারায়ণ।

কল্পনা তো হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো—দাদা, এবার কি হবে আমাদের! দাদা গো, দাদা......

স্বপন নেমে পড়লো গাড়ি থেকে, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো সন্ন্যাসীর পা দু'খানা। কেঁদে ফেললো সে—সন্ন্যাসী বাবাজী, আমাদের বাঁচান..... বাঁচান...

রাজনারায়ণ এক ঝট্‌কায় টেনে তুলে নিলো স্বপনকে। তারপর জব্রুকে ইংগিত করলো!

জব্রু অমনি কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিলো সুতীক্ষ্ণ—ধার ছোরাখানা। জীপ্ গাড়ির সার্চলাইট্ জ্বলছে, তারই আলোতে বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। জব্রুর হাতে ছোরাখানা ঝক্-মক্ করে উঠলো।

স্বপন আর কল্পনা শিউরে উঠলো।

রাজনারায়ণ এবার কল্পনাকে টেনে নামিয়ে আনলো গাড়ি থেকে।

সন্ন্যাসী বাবাজী শব্দ করে উঠলো—হর হর শিবও-শঙ্করও....হর হর শিবও শঙ্করও...

জব্রু স্বপন আর কল্পনাকে টেনে নিয়ে গেলো যমুনার তীরে। গাড়ির আলো এখানে স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে।

রাজনারায়ণ গেলো তাদের সঙ্গে।

রাজনারায়ণ প্রথম স্বপনকে হত্যা করার জন্য ইংগিত করলো।

জব্রু হুঙ্কার ছাড়লো—হুম্ হুম্ হুয়াম—সঙ্গে সঙ্গে সে ছোরাখানা উদ্যত করে রুখে দাঁড়ালো।

কল্পনা আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

পরক্ষণেই বনভূমি প্রকম্পিত করে গর্জে উঠলো রিভলভারের শব্দ।

অমনি ভয়ঙ্কর একটা তীব্র শব্দ করে খুরপাক খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো জব্রু ভূতলে!

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালো রাজনারায়ণ। রাগে ক্ষোভে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো,—দেখলো সন্ন্যাসী বাবাজীর দক্ষিণ হস্তে' উদ্যত রিভলভার। তার মুখের দাড়ি খসে পড়েছে, অস্পষ্ট হলেও রাজনারায়ণের চিনতে বাকি রইলো না—এ যে মিঃ আলম—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

রাজনারায়ণ প্রথমে হক্চকিয়ে গেলো, পরক্ষণেই আঁচ করে নিলো ব্যাপারটা। মুহূর্তে বিলম্ব না করে ভূতললুণ্ঠিত মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ফট্রত জব্রুর হাতের মুঠা থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে।

কল্পনা তখন ছুটে এসে স্বপনকে জাপটে ধরলো—দাদা, দাদা....

স্বপন তখন স্তব্ধ হয়ে দেখছে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

সন্ন্যাসী বাবার প্রতি তার যে একটা ভুল ধারণা জন্মেছিলো এক্ষণে তার দূরীভূত হয়ে যায়।

ভাই এবং বোন দু'জন দু'জকে আঁকড়ে ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে। থরথর করে কাঁপছে দু'জনা।

দস্যু বনহুর রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে, অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে তার। এগিয়ে আসছে বনহুর রাজনারায়ণের দিকে। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার।

রাজনারায়ণ ভড়কে গেলেও সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা বাগিয়ে ধরে রুখে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এগুবার সাহস পাচ্ছে না সে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠে—রক্ত চেয়েছিলাম, এক জনের নিয়েছি। এবার তোমার রক্ত চাই। ...হাঃ হাঃ হাঃ বনহুরের হাস্যধ্বনিতে বনভূমি প্রকম্পিত হয়ে উঠে।

শয়তান দুর্বৃত্ত, রাজনারায়ণ সে হাসির শব্দে ভড়কে যায়। তবু সে ছোরাখানা ঠিকভাবে বাগিয়ে রাখে।

বনহুর বলে উঠে আবার—জব্রুর দ্বারা অনেক করেছো, এবার তোমার শক্তি পরীক্ষার পালা রাজনারায়ণ।

স্বপন আর কল্পনার চোখেমুখে বিস্ময়। সন্ন্যাসী বাবাজী যে অদ্ভুত শক্তিশালী ব্যক্তি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে তারা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসছে ওদের, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারছে না বা বলার মত অবস্থাও এখন নয়। ওরা তাকিয়ে আছে শুধু।

গাড়ির সার্চলাইটের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জমকালো জব্রুর পাহাড়ের মত দেহটা কিছুক্ষণ ছট্ ফট্ করে নীরব হয়ে গেছে। আজ বনহুর তার পিছন দিক থেকে পিঠে গুলী করেছিলো। বনহুর জানতো, জব্রুর বুকে লৌহবর্ম আঁটা থাকে, তার বুকে কিছুতেই গুলী বিদ্ধ হবে না। এবার তাই সে পিছন থেকে গুলী করেছিলো।

রাজনারায়ণের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, সে ভীত নজরে তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো—জীবনে অনেক পাপ করেছো রাজনারায়ণ। শুধু পাপই করোনি, তুমি বহু নিষ্পাপ প্রাণ বিনষ্ট করেছো। মিস্ লুসীর ফুলের মত একটা জীবনকে তুমি সমূলে ধ্বংস করেছো। আবার এই দু'টি অসহায় কচি

জীবন-প্রদীপ আজ নিভিয়ে ফেলতে চেয়েছিলে, ক্ষমা তোমাকে করা যায় না.....

ঠিক্ সে মুহূর্তে রাজনারায়ণ ছোরা হস্তে ঝাপিয়ে পড়তে যায় বনহুরের উপর।

কিন্তু সে সুযোগ আর দেয় না বনহুর তাকে, তার হস্তের রিভলভার গর্জে উঠে।

অমনি তীব্র আর্তনাদ করে ঘুরপাক খেয়ে জব্রুর বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণের বুকের রক্ত আর জব্রুর রক্ত মিশে এক হয়ে যায়।

যমুনার তীরে পাশাপাশি পড়ে থাকে দু'টি মৃতদেহ।

রাজনারায়ণের দেহ নীরব হয়ে যায়।

বনহুর এগিয়ে আসে স্বপন আর কল্পনার দিকে।

স্বপন আর কল্পনা বনহুরের পায়ে প্রণাম করতে যায়।

ধরে ফেলে বনহুর, বলে—আমি সন্ন্যাসী নই, তোমাদের মতই একজন মানুষ।

স্বপন আর কল্পনার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। তারা যে জীবনে বেঁচে আছে একথা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। কে এ মহান ব্যক্তি যে এতো শক্তিমান। যে এতো সহজে দুটি হিংস্র প্রাণ ধ্বংস করতে সক্ষম হলেন।

বললো বনহুর—তোমরা এবার নিশ্চিন্ত। তোমাদের মৃত্যুদূতকে আমি সরিয়ে দিয়েছি। চলো, তোমাদের বাসায় পৌঁছে দি।

স্বপন বললো এতোক্ষণে—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো বাবাজী....

হেসে বললো বনহুর—বাবাজী নয়, বলো দাদা। আর ধন্যবাদ দিতে হবে না, আমি তোমাদেরই একজন।

বনহুর দু'ভাই-বোনকে গাড়িতে তুলে নিলো।

বললো স্বপন—এ জঙ্গলে আমি তো গাড়ি চালাতে পারবো না দাদা।

বনহুর বললো—তোমাকে চালাতে হবে না ভাই, তোমরা চুপ কসে বসো, আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

অবাক হয়ে কল্পনা বললো—আপনি গাড়ি চালাতে জানেন?

তোমাদের দাদা সব জানে, বসো বোন। বনহুর ড্রাইভিং আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

গহন বনে বনহুরের হাতে গাড়িখানা ছুটতে শুরু করলো। পিছনে পড়ে রইলো জব্রু আর রাজনারায়ণের প্রাণহীন দেহ দুটো।

নিয়তির কি পরিহাস!

মারতে গেলো কাদের আর মরলো কারা।
রাজনারায়ণ কি জানতো আজ তাদের আয়ু শেষ হয়ে গেছে।
ভেবেছিলো সে—স্বপন আর কল্পনাকে পথ থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে ফিরবে।

❑

সেদিন স্বপন আর কল্পনা কিছুতেই বনহুরকে ছেড়ে দিলো না। বনহুরও ফেলতে পারলো না ভাই-বোনের অনুরোধ। তারা যেন বহুদিন পর আপন দাদাকে ফিরে পেয়েছে। সেকি আনন্দ তাদের!
এ শহরে দস্যু বনহুরকে কেউ চেনে না।
কাজেই স্বপন আর কল্পনার দাদা হতে তার কোনো অসুবিধা হলো না। বনহুর সাবধান করে দিয়েছে স্বপর আর কল্পনাকে—তারা যেন কারো কাছে ভুলেও কোনোদিন না বলে তার কাকা রাজনারায়ণ আর জব্রু কোথায় গেছে।
স্বপন আর কল্পনা বনহুরকে পেয়ে আনন্দে অধীর! বনহুর যেন তাদের কত পুরোনো বন্ধু বা দাদা। ওরা দু'জনা দাদা বলতে পাগল।
বনহুরের সঙ্গেই সারাদিন দিল্লী শহরটা ওরা চষে ফেরে। অবশ্য বনহুরের উদ্দেশ্য তার সন্ন্যাসী বাবাজীকে অন্বেষণ করা। কাজেই সেও রয়েই গেলো কয়েকদিনের জন্য।
এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় তিন জনা।
কিন্তু বনহুর সন্ন্যাসীর সন্ধান পেলো না। মনটা তার ছট-ফট্ করে উঠলো, তবে কি সন্ন্যাসীর বাবা শহরে কোথাও আট্কা পড়েছে? হয়তো তাই হবে। বনহুর নিজে সন্ন্যাসী সেজে শহরে সন্ন্যাসীদের আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশ্য স্বপন আর কল্পনার অগোচরে সে একাজ করতো।
বলতো স্বপন—দাদা, আপনি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যান বলুন তো?
হেসে জবাব দিতো বনহুর—আমার যে অনেক কাজ ভাই, তাই আমাকে যেতে হয়!
সত্যিই বনহুর শুধু এক কাজ নিয়ে মেতে থাকে না। সন্ন্যাসীদের আখড়ায় আড্ডা দিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর সন্ধান করে, আরও খোঁজ নেয়—সত্যিই এরা আসল সন্ন্যাসী কিনা বা এরা কোনো শয়তান দলের লোক কিনা।

❑

বেশিদিন বিলম্ব করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। একদিন স্বপন আর কল্পনার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে যায় বনহুর কেশব আর নূরীর কাছে।

কিন্তু আশ্রমে গিয়ে অবাক হয়ে যায়, কুঠির শূন্য—কেউ নেই। বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—নূরী—নূরী—নূরী কোথায় তুমি.....

প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, নেই—নেই—নেই—সে নেই.....

দুর্দান্ত দস্যু সর্দার বনহুর মুষড়ে পড়ে, ধপ্ করে বসে পড়ে সে কুঠিরের বারান্দায়। বেদনা কাতর চোখে চারদিকে তাকিয়ে অন্বেষণ করে সে, কোথায় নূরী আর কেশব। সন্ন্যাসী বাবাজীও হয়তো আর ফিরে আসেননি। কেশব আর নূরী গেলো কোথায়? তবে কি কেশবের সঙ্গে নূরী চলে গেছে? কিন্তু কেন সে যাবে তার সঙ্গে। বনহুরের শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে। তাহলে কি কেশবের সঙ্গে নূরীর কোনো সম্বন্ধ ছিলো? বহুদিন একত্রে বসো-বাস করার দরুণ হয়তো.....না না, তা হয় না, নূরী সে ধরনের মেয়ে নয়। পরক্ষণেই আবার মনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নূরী আর কেশবের উপর।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর, অবশ শিথিল পা দু'খানা টেনে নিয়ে চলে নদীতীরে। যেখানে নূরী আর সে বসে বসে দু'জনার জীবনের ঘটনা বর্ণনা করতো। একটা গাছের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ায় বনহুর। তাকিয়ে থাকে সে নদীবক্ষে। একটা মুখ ভেসে উঠে নদীর জলে—অসহায় করুণ মৃত্যুমলিন সে মুখ—লুসী। বনহুরের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু!

গোটাদিন ধরে সমস্ত বনটা চষে ফিরলো বনহুর। নূরী বা কেশবের কোনো সন্ধান পেলো না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো একসময়।

বনহুর নীরবে প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, যে কক্ষে সে পেয়েছিলো নূরীর সাক্ষাৎ। এক পাশে গুটানো রয়েছে খেঁজুর পাতার চাটাইখানা।

বনহুর চাটাইখানা বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো চীৎ হয়ে। অন্ধকার কক্ষ, আলো জ্বালার কোনো উপায় নেই। পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। গোটা দিন তার মুখে কিছু পড়েনি।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বাললো। কক্ষটা ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হলো, দেখলো ওপাশে মাটির প্রদীপটা তৈলবিহীন অবস্থায় দীপগছায় রয়েছে। শুষ্ক সল্‌তেটায় ম্যাচের কাঠিটা বাড়িয়ে ধরলো বনহুর, কিন্তু তেলহীন সলতে জ্বললো না।

অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় এগিয়ে গেলো বনহুর কলসীটার দিকে। কিন্তু কলসী শুন্য, বনহুর হাত দিতেই কলসীটা গড়িয়ে পড়লো একদিকে।

বনহুর ফিরে এলো শয্যায়।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো কত কথা। ভাবলো, আগের মত আজও যদি তার শিয়রে এসে বসতো নূরী, হাত রাখতো তার মাথায়। বনহুর ওকে খপ্ করে ধরে ফেলতো, বলতো কোথায় গিয়েছিলে তুমি? হেসে জবাব দিতো নূরী, সে অনেক দূর গিয়েছিলাম—সাত সমুদ্র তের নদী পার...না না এসব আবোল-তাবোল কি চিন্তা করছে সে। নূরী তার সঙ্গে ছলনা করেছে, তাকে ধোকা দিয়েছে সে। নূরী সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে কেশবের সঙ্গে। নিশ্চয়ই কেশব আর নূরীর মধ্যে অস্পৃশ্য একটা...বনহুর নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। অধর দংশন করতে লাগলো সে।

সমস্ত রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটলো বনহুরের। এতোটুকু ঘুম এলো না তার চোখে। কেনই বা নূরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো, কেনই বা আবার বিচ্ছেদ ঘটলো। তার জীবন থেকে মুছে গিয়েছিলো নূরী সেই ভালো ছিলো!

বনহুর আবার ফিরে এলো দিল্লী নগরীতে।

আনন্দে আপ্লুত হলো স্বপন আর কল্পনা। বনহুরকে পেয়ে খুসীতে উচ্ছল হলো তারা।

বনহুর নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। মনের জমাট ব্যথা-বেদনা আর দুশ্চিন্তাকে ভুলে থাকার জন্য স্বপন আর কল্পনাকে নিয়ে এখানে— সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাজমহল, দিল্লীর দুর্গ, আকবরের সমাধি—বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় বনহুর ওদের নিয়ে। সন্ন্যাসী বাবাজী, কেশব আর নূরীর কথা সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারে না, ভুলতে পারে না ক'দিন আগের স্মৃতিগুলো। হাতড়ে চলে সে কেশব আর নূরীর আচরণের প্রতিটি ধাপ। সত্যিই কি নূরী আর কেশব....না না, ভাবতেও তার মন ঘৃণায় বিষিয়ে উঠে!

বনহুর সারাদিন স্বপন আর কল্পনাকে নিয়ে মেতে থাকলেও রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে তার সেই চিরপরিচিত জমকালো ড্রেসে। দিল্লী শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়ায় আত্মগোপন করে। সন্ধান করে ফেরে কোথায় কাঁদছে অসহায় জনগণ এক মুষ্টি অন্নের তরে। কোথায় ধুকে ধুকে মরছে বিনা ঔষধে মুমূর্ষু রোগিগণ। কোথায় অসহায় নারীর অমূল্য ইজ্জৎ বিনষ্ট হতে চলেছে কোন শয়তান লম্পটের পাপময় নিষ্পেষণে। বনহুর বিনা দ্বিধায় হত্যা করে চললো এই সব পাপ-জর্জ্জরিত কুৎসিৎ লোকদের। তাদের অর্থ লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিতে লাগলো নিঃসহায় সম্বলহীন রিক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে।

শহরে জাগলো আঁতঙ্ক। এক মহা ভীতিকর ভাব। কে এসব হত্যা সংঘটিত করে চলেছে। কে এসব অর্থ লুটে নিচ্ছে। পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে

গেলো। সি আই ডি পুলিশ সমস্ত শহরে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লো কিন্তু কেউ হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো না।

এমন দিনে দিল্লীর পুলিশ সুপার হয়ে এলো মনিরার বান্ধবী মাসুমার স্বামী হাশেম চৌধুরী। মাসুমা শেষ পয়ন্ত মনিরাকে নিয়ে এলো সঙ্গে। মনিরার অমত টিকলো না, মামীমাও জেদ করে পাঠিয়ে দিলেন তাকে। কারণ, মনিরা সবসময়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। দিন দিন সে ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়ছে, কিছুদিন বিদেশে ঘুরে এলে তবু একটু মনোভাব পাল্টাতে পারে তার।

নূর রয়ে গেলো তার দাদীমার কাছে। সরকার সাহেব আর দাদীমা মিলে নূরের সেবায় রইলেন। পড়াশোনা করছে, তাই সে মায়ের সঙ্গে আসতেও চাইলো না। বিশেষ করে মরিয়ম বেগমকেই নূর বেশি ভালবাসতো।

মরিয়ম বেগম নূরকে বুকে নিয়ে পুত্রশোক ভুলতে চেষ্টা করতেন, তাই তিনি সব সময় ওকে নিজের কাছে কাছে সস্নেহে আঁকড়ে ধরে রাখতেন। নূরও তাঁকে মায়ের চেয়ে বেশি সমীহ করতো।

মনিরা দিল্লী এলো বটে কিন্তু মনের অবস্থা তার মোটেই প্রসন্ন হলো না।

হাশেম চৌধুরী আর মাসুমা বান্ধবী মনিরাকে নিয়ে এখানে-ওখানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্থানগুলো দর্শন করে বেড়াতে লাগলো। পুলিশ সুপার-পত্নী মাসুমা ও তার বান্ধবী যখন যেখানে যায়—সঙ্গে থাকে পুলিশ, আর্দালী আর থাকে বন্দুকধারী দেহরক্ষী।

স্বপন আর কল্পনাদের বাড়ির অদূরেই পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরীর বাংলো।

কল্পনা অত্যন্ত মিশুক মেয়ে। সে ছোটবেলা হতেই যে পুলিশ সুপার আসেন তার কন্যার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতো। হাশেম চৌধুরী এখানে আসার পূর্বে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর মেয়ে মিস্ জেসমিন্ ছিলো কল্পনার বান্ধবী। তারা চলে যাবার পর এসেছেন হাশেম চৌধুরী তার স্ত্রী এবং মনিরাকে নিয়ে এ বাংলোয়।

একদিন কল্পনা গিয়ে ভাব জমিয়ে নিলো মাসুমা আর মনিরার সঙ্গে। কল্পনাকে পেয়ে মুগ্ধ হলো মাসুমা আর মনিরা। ওকে বড় ভালো লাগলো এই বিদেশ বিভূঁয়ে। নানা গল্পসল্পের মধ্যে অল্প সময়ে কল্পনা ওদের আপন করে নিলো।

তারপর প্রায়ই আসতো কল্পনা হাশেম চৌধুরীর বাংলোয়। একদিন মাসুমা বললো—কল্পনা, তোমার মাকে বেড়াতে আসতে বলো, কেমন?

কল্পনার মুখ বিষণ্ন মলিন হলো, বললো সে—আমার বাবা-মা কেউ নেই। গলা ধরে আসে কল্পনার, চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হয়ে উঠে।

মাসুমা আর মনিরা ব্যথা অনুভব করে তার কথায়।

মনিরার হৃদয়েই বেশি আঘাত করে তার কথাটা। কারণ সেও পিতৃ-মাতৃহারা অসহায়া। কল্পনার বেদনা সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। বলে মনিরা—বোন, তোমার কে আছে তবে?

আমার শুধু একটি ভাই, আর একটি দাদা আছেন। আমার ভাই বড় দুষ্ট কিন্তু আমার দাদা বড় ভাল, আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। আপনারা যাবেন দিদি আমাদের বাড়ি বেড়াতে?

কল্পনা মাসুমাকে বৌদি আর মনিরাকে দিদি বলে ডাকে।

কল্পনার কথায় বলে মনিরা—যাবো বোন, একদিন আমরা যাবো তোমাদের বাড়িতে।

এখানে কল্পনার সঙ্গে মনিরা যখন নানা গল্পে মেতে উঠেছে তখন তার দাদা দস্যু বনহুর এক বাঈজীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে, ধনকুবের রামচরণকে অনুসরণ করেই সে এসেছে এখানে। রামচরণ দিল্লীর সেরা ধনবান, তার অর্থ সৎ উপায়ে উপার্জিত নয়। নানা-রকম কুকর্ম দ্বারা সে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। দিনে সে অর্থ লুটে নেয়, রাতে তা উজাড় করে দেয় বাঈজীর চরণে।

বনহুর আজ ক'দিন হলো রামচরণকে অনুসরণ করে তার কার্য-কলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। সত্যিই সে শয়তান কিনা, এ সন্ধানটাই সে সংগ্রহ করে যাচ্ছে।

কয়েক দিন বনহুর পর পর এসেছে এখানে।

বাঈজী বনহুরের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাকে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। বনহুর অভিনয় করেছে, অর্থ ঢেলে দিয়েছে উজাড় করে। কিন্তু ধরা দেয়নি সে সম্পূর্ণ রূপে।

বাঈজী নাচ দেখাচ্ছিলো। অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত বাঈজী। চরণে নুপূর, সমস্ত দেহ মূল্যবান অলঙ্কারে আচ্ছাদিত। তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে আছে ধনকুবের রামচরণ। বয়স তার পঞ্চাশের উপর, তবু তার সখ কমেনি। বাঈজী বাড়ি আসা তার নিত্য অভ্যাস।

বনহুর রামচরণের পাশে বসেছে।

আরও কয়েক জন লোক বসে নেশায় ঢুলু ঢুলু করছে আর মাঝে মাঝে জড়িত কণ্ঠে আবোল-তাবোল বকছে।

রামচরণ তেওয়ারী তখন মশগুল, বাঈজীর নাচ তাকে বিমুগ্ধ করে ফেলেছে। অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে সে বাঈজীর দিকে।

বাঈজী আনন্দে আত্মহারা। বিশেষ করে বনহুরকে দেখে তার মনে খুসীর উৎস বয়ে চলেছে। চরণে ঝঙ্কার তুলে নেচে চলেছে বাঈজী।

বনহুর আলগোছে তুলে নেয় রামচরণ তেওয়ারীর পকেট থেকে মানিব্যাগটা। তারপর উঠে দাঁড়ায় আলগোছে।

বাঈজীর নাচ তখন শেষ হয়ে এসেছিলো, বনহুরকে উঠতে দেখে এগিয়ে গেলো তার দিকে—উঠলে কেন বাবুজী?

আজ ঐ বাবুজীদের খুসী করো সুন্দরী, আমি আর একদিন আসবো। কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

ফিরে আসে বাসায় বনহুর এবার।

পথের মধ্যে মানিব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নোটগুঁলো পকেটে রেখেছিলো বনহুর। আসার পথে স্বপন আর কল্পনার জন্য দুটো হীরক আংটি এনেছিলো বনহুর।

বনহুর আসতেই স্বপন আর কল্পনা ছুটে এলো গাড়ির পাশে। নেমে এলো বনহুর, স্বপন একটি হাত ধরলো আর কল্পনা ধরলো আর একটি হাত।

বনহুর এসে দাঁড়ালো হলঘরে।

কল্পনা বললো—দাদা, আজ আমি পুলিশ সুপারের বাংলোয় বেড়াতে গিয়েছিলাম। জানো দাদা, ও বাড়িতে দুটো বৌ আছে। বড্ড ভাল মেয়ে।

তাই নাকি? বেশ তো, তোমার তাহলে খুব মজা হলো। এবার দেখ আমি তোমাদের জন্য কি এনেছি। বনহুর পকেট থেকে বের করে মূল্যবান আংটি দুটো। বলে—কে কোন্‌টা নেবে?

কল্পনা আর স্বপন যার-যেটা পছন্দ তুলে নেয়।

স্বপন বলে—কি দরকার ছিলো দাদা এসব আনার?

কল্পনা বললো এবার —বারে, দাদা দেবেন না তো কে দেবেন?

হেসে বলে বনহুর—কল্পনা, ঠিক্ বলেছো বোন।

হঠাৎ কল্পনা উচ্ছ্বল হয়ে উঠে—ঠিক্ কিন্তু ও বাড়ির দিদি এমনি করে আমাদের আদর করে। সত্যি দাদা, তোমার মত---

কল্পনা আর স্বপন বনহুরকে অত্যধিক আপন জনের মত তুমি বলে সম্বোধন করতো।

❑

বনহুর এমনি করে স্বপন আর কল্পনার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এক টেবিলে বসে খায় ওরা তিন জনা, এক সঙ্গে গল্প করে, এক সঙ্গে বেড়ায়। শুধু রাতের বেলা বনহুরের জন্য আলাদা কক্ষ। সে নিজে ইচ্ছা করে বেছে নিয়েছে তার থাকার জন্য ঘরখানা।

রাতের খাওয়া শেষ করে চলে আসে নিজের ঘরে। এ ঘরখানা সম্পূর্ণ বাড়ির পিছন ভাগে। স্বপন অনেক বলেও তাকে সম্মুখে ভাল সুন্দর কক্ষ নেওয়াতে পারেনি। বনহুর যে কক্ষে থাকে সে কক্ষ বেশ নিরিবিলি এবং এক পাশে। ওদিকেই বাগান। নানা রকম ফলমূল আর ফুলের বৃক্ষ রয়েছে এ বাগানে।

এ কক্ষটা বেছে নেবার কারণ আছে বনহুরের।

পিছন জানালা দিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে যায় সে গভীর রাতে। কাজ শেষ করে ফিরে সে ঐ পথেই। কাজেই কেউ জানে না তার গোপন অভিসন্ধির কথা।

বনহুরের দেওয়া হীরক অংগুরী পরে স্বপন আর কল্পনার আনন্দ আর ধরে না। সবচেয়ে বেশি আনন্দ হলো কল্পনার। সত্যি তার খুব পছন্দ হয়েছে এ আংটিটা।

রাতের খাওয়া শেষ করে শুতে যায় বনহুর।

স্বপন আর কল্পনা চলে যায় নিজ নিজ কক্ষে।

❑

পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী এবং তার পুলিশ মহল হিমসিম খেয়ে গেলো। কোনো রকমে এই গোপন লুট্‌তরাজ আর দস্যুতা বন্ধ করতে পারলেন না। প্রতি রাতেই কোথাও না কোথাও চলেছে এই অদ্ভুত ডাকাতি। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায়—জমকালো পোশাক-পরা এক ব্যক্তির হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে; রিভলভার ধরে সব লুটে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ পর্যন্ত কয়েকটা খুনও সংঘটিত হয়েছে।

ব্যাপারটা সমস্ত শহরে আঁতঙ্ক সৃষ্টি করলেও হাশেম চৌধুরী তাঁর আদালী এবং অন্যান্যকে সাবধানে কথাটা গোপন রাখতে বললেন। কারণ মাসুমা আর মনিরা ছেলেমানুষ—ভয় পেয়ে যেতে পারে। তাই হাশেম চৌধুরী নিজেও কোনোদিন এসব কথা বাসায় বলতেন না।

পুলিশ সুপারের বাংলোর কারো সাহস হলো না এসব জানাতে। বিশেষ করে পুলিশ সুপার বারণ করে দিয়েছেন সবাইকে।

কথাটা হয়তো মনিরার কানে গেলে তার বুক আনন্দে দুলে উঠতো, হয়তো বা তার মনে উকি দিতো আশার একটি আলো। শহরময় এতো হইহুল্লোড় চললেও বাংলোর মনিরা আর মাসুমা জানলো না কিছু। তাদের কানে পৌঁছলো না এসব।

দিল্লীর পত্রিকায় নিয়মিত সংবাদ প্রকাশিত হলেও পত্রিকা বাংলোয় দেওয়া মানা। দুর্বৃত্ত দস্যুর হামলায় শহরবাসী কম্পমান। পুলিশ মহলে ভীষণ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সব সময় দিল্লীর পুলিশ বিভাগ এই অজ্ঞাত দস্যুর জন্য উৎকণ্ঠিত রয়েছে।

হাশেম চৌধুরীকে সব সময় এ ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। কাজেই হাশেম চৌধুরী পাশের শ্যামনারায়ণ মহাশয়ের বাড়ির সঙ্গে তার স্ত্রী এবং মনিরার পরিচয় হবার জন্য খুশীই হলেন তিনি। একদিন নিজে হাশেম চৌধুরী ঐ বাড়ি বেড়াতে গেলেন স্বাভাবিক বন্ধুত্বের খাতিরে। ইতিমধ্যে স্বপন গিয়ে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলো তাঁর সঙ্গে।

হাশেম চৌধুরী স্বপনের সঙ্গেই বেড়াতে এলেন।

তখন বাসাতেই ছিলো বনহুর। হলঘরে বসে সেদিনের পত্রিকা পড়ছিলো সে।

হাশেম চৌধুরীসহ কক্ষে প্রবেশ করে স্বপন।

স্বপনই পরিচয় করিয়ে দেয়—দাদা, ইনিই পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরী। আর ইনি আমার দাদা রঞ্জন।

বনহুর পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরীর করমর্দন করলো।

উভয়ে আসন গ্রহণ করলো।

স্বপন কলিং বেল টিপে বয়কে ডেকে জলখাবারের আয়োজন করতে বললো।

হাশেম চৌধুরী অত্যন্ত মিশুক লোক, অল্পক্ষণেই বনহুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেললেন। তরুণ যুবক হাশেম একথা-সে কথার মধ্যমে এই রহস্যজনক দস্যুতার কথা তুললেন। বললেন—মিঃ রঞ্জন, আমি ভেবে পাচ্ছিনা কে এই দস্যু যে রাতের অন্ধকারে অশরীরী আত্মার মত দিল্লীর বুকে বিচরণ করে ফেরে। পুলিশ বাহিনী সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও প্রতিদিন চলেছে দস্যুতা।

বনহুর শুধু হাসলো।

হাশেম চৌধুরী বললেন—আপনারা আমাদের নিকটবর্তী পড়শী, কাজেই এখন আপনজন বলতে আপনারাই। সব সময় আপনাদের সহায়তা আমার কামনা।

বললো বনহুর—নিশ্চয়ই মিঃ চৌধুরী, সব সময় আমাদের পাশে পাবেন।

এরপর থেকে পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরী মিঃ রঞ্জনবেশী বনহুরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলেন।

উভয়ের বয়স প্রায় সমান, তাছাড়া দু'জনাই বেশ মিশুক ধরনের লোক। হাশেম চৌধুরী বিশ্বাস করলেন বনহুরকে।

অবসর সময় হলেই হাশেম চৌধুরী আসতেন শ্যামনারায়ণ মহাশয়ের বাড়ি। বনহুরের সঙ্গে গল্প করতে বড় ভাল লাগতো তাঁর। বনহুরও যেতো মাঝে মাঝে স্বপনের সঙ্গে বাংলোয়।

ড্রইংরুমে বসে আলাপ করতো।

তারপর গল্পসল্প করে ফিরে আসতো অনেক রাতে।

❑

সেদিন বাংলোর সম্মুখে বাগানে বসে আছে বনহুর আর হাশেম চৌধুরী। ক'দিন আগে একটা ব্যাংক লুট হয়ে গেছে—সে ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছিলো। সন্ধ্যারাতেই একটা জমকালো পোশাক পরা দস্যু রিভলভার ধরে ব্যাংক থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে। পাহারাদার এবং ব্যাংকে কার্যরত লোকজন কেউ কিছু করতে পারেনি। পুলিশের এতো সতর্ক পাহারা থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই চলেছে এরকম অদ্ভুত ডাকাতি।

বনহুর কণ্ঠে সহানুভূতি ভাব এনে বললো—বড় আফসোস্ দস্যু আপনাদের মত পুলিশ বাহিনীর চোখ ধুলো দিয়ে তার কাজ সমাধা করে যাচ্ছে।

শুধু আফসোস্ নয় মিঃ রঞ্জন, পরিতাপের বিষয়— একটা দস্যু এতোগুলো পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে কার্য সিদ্ধি করে যাবে অথচ তাকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হবো না।

পুলিশ সুপার আর মিঃ রঞ্জনবেশী বনহুর যখন বসে আলাপ-আলোচনা করছিলো ঠিক তখন বয় এসে একটা এনভেলাপ হাতে দেয় হাশেম চৌধুরীর।

হাশেম চৌধুরী খুলে ফেলে খামখানা, মাত্র কয়েক ছত্র লিখা একখানা চিঠি। হাশেম চৌধুরী চিঠিখানা পড়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেন—দস্যুর সাহস দেখুন। চিঠিখানা হাতে দেয় বনহুরের। বনহুর পড়ে—

প্রিয় বন্ধু—

সাবধান. আজ রাতে আপনার বাংলোয় আমি আসবো। বিশ হাজার টাকা আমার জন্য মওজুদ রাখবেন।

—রাত্রির ভয়ঙ্কর

চিঠিখানা পড়ে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো বনহুর—রাত্রির ভয়ঙ্কর। অদ্ভুত নাম---

শুধু অদ্ভুতই নয় মিঃ রঞ্জন, একটা বিরাট আঁতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এ দস্যু।

যতই বলুন,পুলিশ সুপারের বাড়ি হানা দেয়া রাত্রির ভয়ঙ্করের কাজ নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ চৌধুরী।

কিন্তু----

কোনো কিন্তু নেই। আপনার বাড়ি পুলিশ ফোর্স দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে, সাধ্য কি রাত্রির ভয়ঙ্কর বাংলোয় প্রবেশ করে।

তবু আমার সন্দেহ জাগছে মিঃ রঞ্জন। আপনি জানেন না, আমার স্ত্রী এবং আমার বোন কত ভীতু। তারা যদি জানতে পারে একথা, তাহলে অস্থির হয়ে পড়বে।

হেসে উঠে বনহুর—পুলিশ সুপারের মুখে একথা শোভা পায় না মিঃ চৌধুরী।

দেখুন মিঃ রঞ্জন, আপনার কথাবার্তায় আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি—আপনি অত্যন্ত সাহসী।

যদি মনে করেন তবে তাই।

দেখুন আমার একটা কথা রাখবেন বলে আশা করি।

নিশ্চয়ই, বন্ধুজনের কথা শিরোধার্য। বলে হাসে বনহুর।

আজ রাতে আমাদের বাংলোয় থাকবেন আপনি।

পুলিশ সুপার হয়ে আমাকে একি অনুরোধ---আপনি আমার বন্ধু এবং পরম আত্মীয়ের চেয়েও বেশি। বেশ, যদি ভাল মনে করেন তাহলে আসবো।

পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরীর কাছে বিদায় নিয়ে তখনকার মত চলে গেলো দস্যু বনহুর।

❑

বনহুর দিল্লী শহরে সন্ন্যাসী বাবাজীর সন্ধানে গেলেই, ফিরে এসেছিলেন সন্ন্যাসী বাবাজী। এসে যখন জানতে পারলেন কেশব আর ফুলের জেদে বাবুজী গেছে দিল্লী নগরে, তখন চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শরীর ভাল না থাকায় পুনরায় বাবুজীর খোঁজে যেতে পারেননি তিনি।

তাঁর এক কঠিন অসুখ দেখা দিয়েছিলো, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন—হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি এটা।

গহন বনে ডাক্তার-কবিরাজ নেই। সন্ন্যাসী বাবাজী নিজেই যা পারলেন গাছ-গাছড়ার রস খেলেন, কিন্তু আয়ু যখন ফুরিয়ে যায় তখন আর কোনো চেষ্টাই সফল হয় না। সন্ন্যাসী বাবাজী অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই তিনি আর কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। কেশব আর নূরীর প্রচেষ্টা, সেবা-যত্ন সব ব্যর্থ করে দু'দিন পর চলে গেলেন তিনি পরপারে। নশ্বর দেহ পড়ে রইলো পৃথিবীর বুকে, প্রাণপাখি গেলো উড়ে।

অনেক কাঁদলো কেশব আর নূরী। কেঁদে আর কি হবে!

তারপর সন্ন্যাসী বাবাজীর মৃতদেহটা ভাসিয়ে দিলো ওরা নদী বক্ষে।

দুটোদিন আরও প্রতীক্ষা করলো কেশব আর নূরী। গহন বনে একা একা দু'টি তরুণ আর তরুণী এভাবে কাটানো সম্ভব নয়। নূরী সাহসী নারী হলেও ভীত হলো, সন্ন্যাসী বাবাজীর মৃত্যুতে ভড়কে গেছে ওরা। এমন দিনে যদি বনহুর পাশে থাকতো তাহলে নূরী একটুও বিচলিত হতো না।

বনহুরের প্রতীক্ষায় ক'টা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দিলো বটে কিন্তু দিন যেন আর যায় না।

নূরী কেশবের কাছে জেদ ধরে বসলো তারা শহরে চলে যাবে—যেখানে তার বনহুর গেছে। যেমন করে হোক খুঁজে বের করবেই তাকে।

একদিন জঙ্গলের আশ্রম ত্যাগ করে কেশব আর নূরী রওয়ানা দিলো দিল্লী নগরের দিকে।

সেই-থেকে কেশব আর নূরী অহরহ খুঁজে ফিরছে বনহুরকে। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না ওরা।

কেশব আর নূরী আশ্রয় নিয়েছে এক সাপুড়ে দলে।

ওদের সঙ্গে সাপের ঝাঁকা নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় ফুল আর কেশব। বাবুদের বাড়ি বাড়ি সাপ খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে।

সারাদিন সাপ খেলা দেখিয়ে যা পায় তাই দিয়ে চাল-ডাল কিনে রাতের বেলা রান্না করে খায় ওরা। দিল্লী শহরের অনতিদূরে ঘেরুয়া পাড়ায় তাদের আস্তানা। ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে থাকে নূরী আর বারেন্দায় শোয় কেশব।

সেদিন বনহুর চলে গেলো যখন পুলিশ সুপারের বাংলো থেকে, পরক্ষণেই দূরে শোনা গেলো—বাবু, সাপ খেলা দেখিয়ে বাবু। সাপ খেলা--

অন্দরবাড়ি থেকে মাসুমা আর মনিরা বেরিয়ে এলো দ্রুত। আর্দলী দিয়ে সাপুড়েদের ডেকে পাঠালো।

মিঃ হাশেম চৌধুরীর মনের অবস্থা ভাল নয়, একটু পূর্বে যে চিঠি তিনি পেয়েছেন তার জন্য যদিও তিনি ভীত নন তবু একটা অহেতুক আতঙ্ক জাগছে তাঁর মনে।

মাসুমা আর মনিরার অনুরোধে কেশব সাপের ঝাঁকা নামিয়ে রাখলো।

কেশবের দেহে সাপুড়ের ড্রেস, আর নূরীর পরণে ঘাগ্ড়া, গায়ে ব্লাউজ আর ওড়না। উভয়ের কানেই বড় বড় বালা রয়েছে।

সাপ খেলা শুরু হলো।

কেশব বাঁশী বাজায় আর নূরী সাপ খেলার তালে তালে করুণ মিষ্টিসুরে গান গায়। অদ্ভুত পাহাড়ী গান বড় সুন্দর মধুর সে সুর।

মুগ্ধ হয়ে যায় মনিরা আর মাসুমা।

সাপ খেলা দেখানো শেষ করে বিদায় চায় কেশব আর নূরী।

মনিরা খুশী হয়ে নিজের হাতের দু'গাছা চুরি খুলে দেয় নূরীর হাতে।

হাশেম চৌধুরী টাকা দেন।

চলে যায় ওরা।

মনিরা আর মাসুমা বলে দেয়—তারা আবার যেন আসে।

কেশব আর নূরী কথা দেয়, আসবো।

ওরা চলে যেতেই বলে মাসুমা স্বামীকে লক্ষ্য করে—আজ তোমাকে বড্ড চিন্তিত লাগছে, ব্যাপার কি বলো তো?

কিছু না। হাশেম চৌধুরী স্ত্রীর নিকটে কিছু না বললেও তাঁর অন্তরে একটা দুর্ভাবনা তালগোল পাকাচ্ছিলো।

হাশেম চৌধুরী গম্ভীর হয়ে রইলেন, সন্ধ্যার পর পরই তাঁকে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

মাসুমা হেসে বললো—শুনলাম তোমার বন্ধু মিঃ রঞ্জন সেন এসেছিলেন। কি হলো, তিনি কি কোনো দুঃসংবাদ শুনিয়ে গেলেন?

না, তিনি নন। তবে আজ একটা দুঃসংবাদ শুনেছি যার জন্য আমার মনে স্বস্তি নেই।

মনিরা শিউরে উঠলো বললো সে—কান্দাই থেকে কোনো সংবাদ আসেনি তো? আমার নূর ভাল আছে কিনা কে জানে---

আপা, আপনি অযথা চিন্তা করছেন, কান্দাই এর-কোনো সংবাদ নয়। এখানেই এবং আজ রাতের একটি ব্যাপার নিয়ে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি।

কতকটা আশ্বস্ত হলো মনিরা।

মাসুমা তেমনভাবে আর জেদ করলো না স্বামীর কাছে। পুলিশের লোক—তাদের কখন কোন্ চিন্তা কে জানে। সব কথাই তো আর তাকে বলেনও না হাশেম চৌধুরী।

বললেন হাশেম চৌধুরী এবার—মাসুমা, আজ আমার বন্ধু রঞ্জন এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

বেশ তো দু'বন্ধু মিলে গোটারাত গল্পেসল্পে কাটিয়ে দিও।

আর তোমরা দু'বান্ধবী খুব করে বুঝি ঘুমাবে?

মোটেই না।

তবে কি তোমরাও ---

হাঁ, আমাদের কত কথা আছে, কত গল্প আছে, যা গোটারাত ধরে শুনলে আর শোনালে ফুরোবেনা। কি বলিস্ ভাই মনিরা, তাই না?

মনিরা মাথা দোলালো।

বললো মাসুমা—তোমার বন্ধুকে আজও চোখে দেখলাম না। আজ কিন্তু পরিচয় করিয়ে দিতে হবে তার সঙ্গে। শুনেছি তোমার বন্ধু নাকি সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারে।

তাই নাকি? কে বললো একথা? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন হাশেম চৌধুরী।

বললো মাসুমা—স্বপন আর কল্পনার মুখে শুনেছি।

বেশ, তাহলে আজ সমস্ত রাত পিয়ানো শুনে কাটানো যাবে।

❑

সন্ধ্যার পর।

বনহুর এলো।

হাশেম চৌধুরীর অনুরোধে পিয়ানোটা আনতে হয়েছে তাকে।

মাসুমা এসে পরিচয় করে নিলো এবার আগ্রহান্বিত হয়ে। কিন্তু মনিরা কিছুতেই এলো না তার সামনে। এ ছাড়া মনিরা কারো সম্মুখেই বড় আসতে চাইতো না। আজও মনিরা এলো না, এলে সে দেখতো তার আকাঙ্খিত জনই হলো মিঃ রঞ্জন সেন।

পাশের ঘর থেকে সে শুনবে পিয়ানো বাজানো—বললো মনিরা। অনেক বলেও যখন মাসুমা তাকে ড্রইংরুমে আনতে সক্ষম হলো না তখন সে একাই এসে গল্পেসল্পে মেতে উঠলো। স্বামীর বন্ধু হিসেবে মাসুমা তাকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করলো।

হাশেম চৌধুরী সজাগ পুলিশফোর্স পাহারা রত রেখেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না নিজেও পকেটে রিভলভার রেখে বসে ছিলেন। কোন্ মুহূর্তে রাত্রির ভয়ঙ্কর হামলা করে বসবে কে জানে!

বনহুরের সঙ্গে স্বপনও এসেছে, সেও আনন্দে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে —তার রঞ্জন দাদার পিয়ানো বাজানো শুনবে।

নানা গল্প-গুজবের পর বনহুর পিয়ানোর পাশে এসে বসলো।

পাশাপাশি সোফায় বসে আছে হাশেম চৌধুরী আর স্বপন। একপাশে বসেছে মাসুমা।

পাশের ঘরে মনিরা বসে বই পড়ছিলো।

মাঝে মাঝে ড্রইংরুম থেকে ভেসে আসছিলো ওদের হাসি গল্পের আওয়াজ আর হাসির শব্দ।

এবার শুরু হলো পিয়ানোর ধ্বনি।

পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে।

অপূর্ব অদ্ভুত সে সুর।

মনিরা বই পড়ছিলো, বই রেখে ঠিক্ হয়ে বসলো। এমন পিয়ানো সে কোনোদিন শোনেনি। তন্ময় হয়ে শুনছে মনিরা। তার সমস্ত অন্তর যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে সুরে।

রাত বেড়ে আসছে।

এতো সুরেও হাশেম চৌধুরীর মনে স্বস্তি নেই, বার বার তিনি ড্রইংরুমের মেঝেতে পায়চারী করছেন। পকেটে তার গুলীভরা রিভলভার। বাংলোর চারপাশে পাহারা দিচ্ছে সর্তক রাইফেলধারী পাহারাদার।

বনহুর পিয়ানো বাজাচ্ছে।

মাসুমাও তন্ময় হয়ে গেছেন যেন।

স্বপন সোফার হাতলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ কৃষ্ণ একাদশী।

চাঁদ এখন উঠেনি।

আকাশ অন্ধকার। শুধু তারার মালা জোনাকীর মত পিট পিট করে জ্বলছে।

বাংলোর আশেপাশের বাড়িগুলো একসময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।
বনহুরের হাতে পিয়ানো যেন থামতে চায় না। একি, এমন মন মাতানো সুর এর আগে তো কোনোদিন কেউ শোনেনি।
পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী বার বার হাই তুলছেন।
মাসুমার চোখেও নিদ্রা দেবী আসন গেড়ে নিয়েছেন।
পাশের ঘরে মনিরা অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।
বাংলোর চারপাশে পুলিশ ফোর্স রাইফেল হস্তে ঝিমুচ্ছে—এমন সুর তারাও যে শোনেনি কোনোদিন।
হাশেম চৌধুরী বললেন—মিঃ রঞ্জন আর যে পারছি না ভাই। বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।
বললো বনহুর—আমারও দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে।
না না, তা হয় না বন্ধু, আরও একটু বাজান। আমি জেগে থাকতে চাই।
বেশ, বাজাচ্ছি, আপনি শুনুন মিঃ চৌধুরী।
বনহুর আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করলো।
এবার মনিরা স্থির থাকতে পারলো না, সে নিজের অজ্ঞাতে ড্রইংরুমের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো। কে এই পিয়ানো বাদক, যার সুর সৃষ্টি করে এক অভিনব পরিবেশ। মনিরা পর্দার ফাঁকে দৃষ্টি ফেললো ড্রইংরুমের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে থ'মেরে গেলো মনিরা—একি দেখলো সে—তবে কি তার চোখের মোহ। দু'হাতে চোখ রগড়ে তাকালো আবার —না তো, কোনো ভুল নেই—
এ যে তার স্বামী। মনিরা দুই হাতে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিলো।
একটু স্থির হয়ে আবার তাকালো সে ড্রইংরুমের মধ্যে। কিছুতেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছে না। নিশ্বাস দ্রুত বইছে; বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছে। ছুটে গিয়ে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো তার কিন্তু পারলো না—সত্যিই যদি সে না হয়।
ঠিক্ সে মুহূর্তে বনহুর পিয়ানো রেখে ফিরে বসলো।
এবার মনিরা বনহুরকে স্পষ্ট দেখতে পেলো; আনন্দে নিজেকে কিছুতেই যেন ধরে রাখতে পারছে না সে; তবু শক্ত হলো মনিরা—কঠিন করে নিলো নিজেকে। এতোদিন যদি সহ্য করে থাকে আর সামান্য সময় অপেক্ষা করতে পারবে না! শত শত বার মাসুমাকে অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানালো। ভাগিস্ সে ওর সঙ্গে এসেছিলো, না হলে এই সুদূর ভারতবর্ষে তার আসাও হতো না, পেতো না স্বামীকে।
মনিরা এবার বুঝতে পারলো কেন মনির আর যায় না তার পাশে। রহমান তার বিশ্বস্ত অনুচর হলেও সন্ধান জানে না—কোথায় রয়েছে তাদের সর্দার।

মনিরা খুশীতে উচ্ছল।

দরজার পাশ থেকে খাটে এসে বসলো মনিরা।

মাসুমাও এলো এবার।

মনিরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো বান্ধবী মাসুমাকে—মাসু অপূর্ব!

নিদ্রায় মাসুমার চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করছিলো—মনিরাকে আনন্দে অধীর হতে দেখে নিদ্রা ছুটে গেলো, অবাক হয়ে বললো—খুব যে খুশী দেখছি! মিঃ রঞ্জনবাবুর পিয়ানো দেখছি তোকে একেবারে উচ্ছল করে তুলেছে?

হাঁ মাসুমা, আমি যেন ওর সুরে আত্মহারা হয়ে পড়েছি।

ওকে দেখিসনি, দেখলে বুঝতিস্ যেমন তার রূপ তেমনি তার পিয়ানোর সুর। চল্না দেখা করবি?

না আজ নয় আর একদিন।

নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে সমস্ত বাংলোটা।

শুধু জেগে আছে বাংলোর বাইরে পুলিশ ফোর্স। তারা রাইফেল কাঁধে সজাগ পাহারা দিচ্ছে।

হাশেম চৌধুরীও তাঁর কক্ষে জেগে বসেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। তিনি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। মাসুমা তো অনেকক্ষণ শুয়েছে, তার ঘুম গভীর হয়ে এসেছে।

শুধু পাশের ঘরে জেগে মনিরা। আজ কি তার চোখে ঘুম আসে! ড্রইংরুমের পাশের কামরা গেষ্টরুম। ও ঘরে আছে স্বপন আর রঞ্জন সেন।

মনিরা জানে, নিশ্চয়ই তার স্বামী এ বাড়িতে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে রাত্রি যাপন করতে এসেছে। তাই মনিরা সজাগ প্রহরীর মত জেগে। মনিরা এবার উঠে এসে গেষ্টরুমের পাশে অন্ধকারে দাঁড়ালো, পাশের জানালার ফাঁক দিয়ে নজর ফেললো কক্ষমধ্যে। দেখলো সে—বনহুর পিয়ানো খুলে বের করে নিলো জমকালো পোশাক। পরে নিলো দ্রুত হস্তে। তারপর পিয়ানোর মধ্য হতে বের করলো একটি রিভলভার। চেপে ধরে পা বাড়ালো দরজার দিকে।

অমনি পর্দার আড়াল থেকে নারীকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো —খবরদার, এক পা এগুলে বা পিছুলে মরবে।

বনহুর তাকালো ওদিকের জানালায়। অস্পষ্টভাবে নজর পড়লো—জানালার পর্দার ফাঁকে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দেখা যাচ্ছে। রিভলভার সেটা বুঝে নিতে বাকী রইলো না তার।

প্রতিধ্বনি – ২৮

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

থমকে ফিরে তাকায় বনহুর।

মুখে তার কালো গালপাট্টা জড়ানো ছিলো। মাথায় পাগড়ী। ডিম্ লাইটের আধো অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বনহুরের। দেখলো, পর্দার ফাঁকে বেরিয়ে আছে একটা পিস্তলের মুখ।

জীবনে বনহুর বহু দস্যুতা করেছে কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপারে কোনোদিন সে পড়েনি। বনহুর বেশ হকচকিয়ে গেলো, বললো সে—কে তুমি?

নারীকণ্ঠের হাস্যধ্বনি হলো—আমি কে জানতে চাও? আবার হেসে উঠলো নারীকণ্ঠ।

বনহুর কান পেতে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, এ স্বর কোথাও সে শুনেছে কিনা। এটা নূরীর কণ্ঠ নয় তা বেশ বুঝতে পেরেছে বনহুর। বললো এবার—হাঁ, আমি জানতে চাই—কে তুমি।

এবার মেয়েলী কণ্ঠ পুনরায় উচ্চারণ করলো—আমার পরিচয় আজ পাবে না দস্যু বনহুর!

ওঃ, আমার পরিচয় তুমি জানো দেখছি?

আরও জানি—তোমার জীবনের সব ঘটনা আমি অবগত আছি।

তুমি কে বলো?

আমার পরিচয় তুমি পাবে না। আর শোন, তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছো তা সফল হবে না। পারবে না তুমি এখানে কোনো ক্ষতি করতে।

তাহলে তুমি... ...

হাঁ, তোমাকে মুক্তি দেবো। শীঘ্র তোমার হস্তের রিভলভার ত্যাগ করো। খুলে ফেলো তোমার দস্যু-ড্রেস। লুকিয়ে রাখো পিয়ানোর মধ্যে।

নইলে কি করবে?

এক পা এগুলে বা পিছুলে তোমাকে গুলী করে হত্যা করবো। পুনরায় বলছি, ত্যাগ করো তোমার রিভলভার।

বনহুর এবার বাধ্য হলো তার হস্তস্থিত রিভলভারখানা নামিয়ে রাখতে।

খোলো তোমার দস্যু-ড্রেস।

বনহুর এবার তার শরীর থেকে জমকালো দস্যু-ড্রেস খুলে ফেললো। লুকিয়ে রাখলো পিয়ানোর মধ্যে।

এবার বললো নারীকণ্ঠ—যাও, তোমার শয্যায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ো। কথা দিলাম, কেউ জানবে না তোমার এ অদ্ভুত কাজের কথা। জানবে না তোমার আসল পরিচয়... ...

বনহুর সুবোধ বালকের মত শয্যা গ্রহণ করলো।

কোনো যাদুমন্ত্রে সে যেন আজ পুতুল বনে গেছে। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলো বনহুর। একটা নারীর কাছে আজ তার চরম পরাজয়!

কখন যে বনহুর ঘুমিয়ে পড়েছে।

❑

রাত ভোর হতেই মিঃ হাশেম চৌধুরী এসে জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে- সুপ্রভাত বন্ধু! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি। আপনার পিয়ানোর সুর আজ আমাকে 'রাত্রির ভয়ঙ্করের' কবল থেকে রক্ষা করেছে।

স্বপনও ততক্ষণে জেগে উঠেছে।

বনহুর থতমত খেয়ে গেলো, কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলো সে। এ বাড়িতে এমন কেউ আছে, যে তার আসল পরিচয় জানে। বনহুর আর বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারলো না বা করবার মত তার মনোভাব ছিলো না। আজ সে এমনভাবে পরাজয় বরণ করবে কল্পনা করতে পারেনি।

বনহুর যতই সরে পড়ার চেষ্টা করুক মাসুমা কিন্তু তাকে ছাড়লো না, জোর করে চা-নাস্তা ভোজন কাজ সমাপ্ত করে তবেই ছুটি দিলো। আর বলে দিলো, পুনরায় আমাদের পিয়ানো শোনাতে হবে। যাবো একদিন আপনাদের ওখানে পিয়ানো শুনতে।

বনহুর আর স্বপন চলে এলো পুলিশ সুপারের বাংলো থেকে। কিন্তু মন তার সচ্ছ নয়। গভীর চিন্তায় মগ্ন সে—কে ঐ নারী যে জানে তার আসল পরিচয়। সুদূর দিল্লী নগরীতে কে সে?

ওদিকে মনিরার মনে আজ আনন্দের উৎস।

তার মহামূল্য রত্নের সন্ধান আজ পেয়েছে। পেয়েছে তার স্বামীর দর্শন। মনিরা কিছুতেই যেন এ আনন্দ বুকে চেপে রাখতে পারছিলো না। আবার প্রকাশ করবার মত দুঃসাহসও হচ্ছিলো না। যদিও মনিরা হৃদয়ের গোপন আনন্দ-উৎস হৃদয়েই চেপে রাখার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু তার কিছুটা ফুটে উঠেছিলো ওর চোখে-মুখে।

মনিরা খুসীতে আত্মহারা!

মাসুমা চিরগম্ভীরা বান্ধবীকে উজ্জ্বল-দীপ্ত হতে দেখে সেও সুখী হলো অনেক। ভাবলো, তাদের প্রচেষ্টা তাহলে সার্থক হয়েছে। মনিরার মুখে হাসি ফোটানোই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

মনিরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে মাসুমা—মনিরা, রঞ্জন বাবুর পিয়ানো শোনার পর থেকে তোমাকে সত্যি বড় সচ্ছ মনে হচ্ছে। তার সঙ্গে যদি পরিচিত হতে তাহলে আরও মুগ্ধ হতে। অদ্ভুত মানুষ রঞ্জন বাবু। দেখতে যেমন সুন্দর-সুপুরুষ তিনি, তেমনি হাস্যোদীপ্ত স্বভাব। বড় ভাল লোক কিন্তু.. ...

হোক, আমি কারো সঙ্গে পরিচয় করতে রাজী নই ভাই। উনার পিয়ানোর সুর সত্যি অপূর্ব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু অপূর্বই নয়, সমস্ত অন্তরকে বিমুগ্ধ করে ফেলে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ক'দিন বেশ কেটে গেলো।

শহরে রাত্রির ভয়ঙ্করের ভয়াবহ উপদ্রব ক'দিন আর হয়নি। বেশ শান্তই মনে হচ্ছে দিল্লী নগরীটা আজকাল। দিল্লী পত্রিকা এ নিয়ে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পাচ্ছে।

আজকাল পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরী রঞ্জন বাবুর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রায়ই তিনি আসেন তার পিয়ানো শুনতে। সেদিন মাসুমা মনিরাকে ধরে বসলো—চল না ভাই, আজ কল্পনাদের বাড়ি।

শেষ পর্যন্ত দেখছি কল্পনার দাদার পিয়ানোর সুরে আকৃষ্ট হলি। বলি মিঃ চৌধুরীর উপায় কি হবে বলতো?

কেন, তুই না হয় আমার হয়ে এদিকটা চালিয়ে নিস্। বললো মাসুমা।

মনিরা রাগ করার ভান করে বলে—বড্ড দুষ্ট হয়েছিস্ মাসুমা।

আমার চেয়ে তুই বেশি দুষ্ট। কেবল, সত্যি ভাই ওর পিয়ানোর সুর আমাকে মুগ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখছি ভদ্রলোকের....প্রেমে পড়ে না যাস্?

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন হাশেম চৌধুরী—তাহলে এ বান্দার কি হবে?

মাসুমা আর মনিরা চমকে উঠে। বিব্রত বোধ করে মনিরা, বিশেষ করে হাশেম চৌধুরীর সম্মুখে সে লজ্জিত হয়। বেরিয়ে যায় মনিরা কক্ষ থেকে।

মাসুমা আর হাশেম চৌধুরী মিলে চলে নানা রসপূর্ণ আলাপ-আলোচনা।

❑

সেদিন সন্ধ্যায় মাসুমা মনিরাকে সঙ্গে করে যায় কল্পনাদের বাড়ি বেড়াতে। মাসুমার উদ্দেশ্য রঞ্জন বাবুর পিয়ানো শুনবে।

মনিরা কিন্তু নতুন এক জেদ ধরে বসলো,—সে বোরখা পরে তবেই গেলো। আজকালকার মেয়ে হয়ে একি সেকেলে ফ্যাশান!

মনিরা নির্বাক, কোনো কথা সে বললো না।

হাশেম নৌধুরী আজ অফিসের কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। কাজেই মাসুমা আর মনিরা এলো এ-বাড়ি।

কল্পনা, স্বপন আর রঞ্জন তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

মাসুমা আর মনিরা গাড়ি থেকে নেমে হলঘরে প্রবেশ করলো। মাসুমার সঙ্গে বোরখা-পরা একটি যুবতীকে দেখে অবাক হলো ওরা। কল্পনা বললো—মাসু বৌদি, এ কালের মেয়ে হয়ে দিদি বোরখা পড়েন কেন?

হেসে বললো মাসুমা—ওর সখ।

বোরখার মধ্য থেকে সুমিষ্ট একটি কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো—মুসলমান হয়ে বেপর্দা করা মোটেই উচিৎ নয়। তাই আমি এভাবে চলাফেরা করি।

বললো রঞ্জনবেশী বনহুর—এ জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাসুমা হেসে উঠলো—বেশতো, বোরখার মধ্য থেকে আমার বান্ধবী আপনার ধন্যবাদ আদায় করে নিলো। আগে জানলে আমিও বোরখা পরে আসতাম। ওঃ ভুলেই গেছি, আমার বান্ধবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় নি এখনও। ওর নাম.......

মাসুমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো মনিরা—আমার নাম আলেয়া।

মাসুমা অবাক হলো, তবু মনিরার কথায় যোগ দিয়ে বললো—হাঁ, ওর নাম আলেয়া।

বললো বনহুর—বেশ নাম; হাঁ, উনি আলেয়াই বটে।

স্বপন আর কল্পনা এতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো হাবার মত।

বললো বনহুর—বসুন আপনারা।

মাসুমা একটা সোফায় বসে পড়ে বললো—আলেয়া, বোস্ ভাই।

বললো মনিরা।

এবার বনহুর, স্বপন ও কল্পনা আসন গ্রহণ করলো।

স্বপন বললো—বৌদি, আপনারা এসেছেন, সত্যি আমরা অনেক খুসী হয়েছি।

কল্পনাও যোগ দিলো দাদার কথার সঙ্গে।

মাসুমা বললো—রঞ্জন বাবু, আপনার পিয়ানোর সুর আমাদের টেনে এনেছে। এবার বুঝতেই পারছেন ব্যাপারখানা, আমার পর্দানশীন বান্ধবী আলেয়া পর্যন্ত থাকতে পারলো না, সেও ছুটে চলে এলো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকালো বনহুর বোরখা—ঢাকা মুখখানার দিকে। কে ঐ বোরখার অন্তরালে, যে জানে তার আসল পরিচয়।

মনিরা বুঝতে পারে—বনহুর তাকে সন্দেহ করেছে। কারণ মাসুমার সঙ্গে তাকে বোরখা-পরা অবস্থায় বড় বেমানান লাগছিলো। তাছাড়া পরশু রাতে

পুলিশ সুপারের বাংলোতে ওকে যেভাবে বেকুক বানিয়ে দিয়েছে মনিরা, তাতে সন্দেহ না করে উপায় ছিলো না বনহুরের।

মনিরার মুখ বনহুর দেখতে না পেলেও মনিরা বনহুরের মুখোভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করছিলো। হাসি পাচ্ছিলো মনিরার; জানে সে—বনহুর বুঝতে পেরেছে—বাংলোর সেই অদৃশ্য নারীই এই বোরখাধারিনী।

মনিরা আরও সাবধান হয়ে যায়। কিছুতেই সে এতো সহজে ধরা দেবে না ওকে। তাকে ও কাঁদিয়েছে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। এবার খুঁজে পেয়েছে। হয়তো ভাগ্য—তাই সে নিয়তির টানে চলে এসেছে সুদূর ভারতবর্ষে। মনিরা স্বামীর দর্শনে আনন্দে অধীর হয়েছে, কতবার ধৈর্যহারা হয়েছে তবু নিজেকে কঠিন করে রেখেছে। সে দেখতে চায় স্বামীর আসল রূপ।

নিজেকে কঠিন করে রাখে মনিরা, নিজের মধ্যে এতোটুকু দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি। বনহুর বললো এবার—মিসেস চৌধরী, আপনার পর্দানশীন বান্ধবী কষ্ট করে এসেছেন আমার পিয়ানো শুনতে। এ জন্য আমি আনন্দিত।

তাহলে এবার শুরু করুন। বললো মাসুমা।

রঞ্জনবেশী বনহুর পিয়ানোর পাশে এসে বসলো।

স্বপন কলিং বেল টিপে বয়কে ডেকে জলযোগের আয়োজন করতে বললো।

কল্পনা তো একটা আসন দখল করে নিয়ে বসেছে। সে তার রঞ্জন দাদার হাতে পিয়ানো শুনতে পাগল হয়ে পড়ে।

বনহুর পিয়ানো বাজাতে শুরু করলো।

সুরের মূর্চ্ছনায় মুখর হয়ে উঠলো হলঘর।

তন্ময় হয়ে গেছে মাসুমা।

মনিরার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। বোরখার আবরণে তার মুখমণ্ডল যদি ঢাকা না থাকতো তাহলে সবাই দেখতো, মনিরার মুখ আনন্দে দীপ্তময় হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত এক দিপ্ততায় উজ্জ্বল হয়েছে তার নয়ন দু'টি। মনিরা কিছুতেই নিজকে যেন ধরে রাখতে পারছিলো না। স্বামী-হস্তের পিয়ানোর সুর তাকে আবছন্ন করে ফেলেছিলো। সমস্ত শিরায় শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছিলো একটা উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। সোফায় ঠেশ দিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

বনহুরের পিয়ানো থেমে যায়।

কিন্তু কক্ষমধ্যে পিয়ানোর সুরের প্রতিধ্বনি তখনও সৃষ্টি করে চলেছে এক অপূর্ব পরিবেশ।

চা-নাস্তা আসে।

বনহুর উঠে আসে পিয়ানোর পাশ থেকে।
চায়ের টেবিলে বসে ওরা সবাই মিলে।
মাসুমাও উঠে যায় টেবিলের পাশে।
মনিরা তখনও বসে আছে নিজের আসনে।
মাসুমা ওকে লক্ষ্য করে হেসে বলে—কিরে আলেয়া, অমনি চুপ হয়ে গেলি দেখছি। রঞ্জন বাবুর পিয়ানোর সুর শুধু আমাকেই বিমুগ্ধ করে ফেলেনি, তোকেও দেখছি একেবারে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।
মাসুমার পরিহাস-বাক্যে মনিরা যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। উঠে দাঁড়ায় মনিরা, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করছো মাসুমা। রঞ্জন বাবুর পিয়ানোর সুর আমাকে মুগ্ধ করেছে সত্যি কিন্তু তার সুরের মোহ আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে পারবে না কোনোদিন।
মাসুমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়, সত্যি কথাটা বলে সে হয়তো ভুলই করেছে। আরও ভাবে, মনিরা অবিবাহিত মেয়ে নয়। তার স্বামী আছে, সন্তান আছে, একটা অপর পুরুষ সম্বন্ধে এভাবে বলাটা অত্যন্ত বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে।
চা-নাস্তা-পর্ব শেষ করে যখন বিদায় নিলো মাসুমা, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।
রঞ্জনবাবুবেশী বনহুর, স্বপন আর কল্পনা গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। যদিও বেশিদূর নয় বাংলোটা, তবু পুলিশ-সুপারের সহধর্মিনী হেঁটে যাবেন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে—এ হতে পারে না, কাজেই গাড়ি নিয়ে এসেছিলো ওরা।
গাড়িতে বসে হাত নাড়ে মাসুমা—আবার আসবো কিন্তু রঞ্জন বাবু, পিয়ানো শোনাতে হবে।
আসবেন। বললো বনহুর।
কল্পনা আর স্বপন একসঙ্গে বললো—যত খুসী পিয়ানো শুনবেন মাসুমা বৌদি। আসবেন আবার।
গাড়ি চলে গেলো।
ফিরে এলো ওরা তিনজনা হলঘরে।
হলঘরে প্রবেশ করতেই বনহুরের নজর চলে গেলো যে আসনটায় বসেছিলো বোরখা-পরা মহিলাটি। একটা ছোট্ট কাগজ ভাঁজ করা পড়ে আছে বলে মনে হলো তার।
বনহুর স্বপন আর কল্পনা কথা বলতে বলতে কক্ষমধ্যে এগুচ্ছিলো।
স্বপন বলছিলো—রঞ্জন দা, মাসুমা বৌদি খুব সুন্দর, তাই না? বেশ মিশুক মেয়ে কিন্তু। আমার বড্ড ভাল লাগে মাসুমা বৌদিকে।

কল্পনা বলে উঠে—আলেয়াদিকে তুমি তো দেখোনি রঞ্জন দা। সত্যি অদ্ভুত মেয়ে আলেয়াদি। যেমন রূপ তেমনি গুণ। মাসুমা বৌদির চেয়ে অনেক সুন্দরী....

রেখে দে, সুন্দরী হলে সে আবার ভূতের মত বোরখা পরে থাকে নাকি? তাহলে সব সময়.......

সব সময় রূপ দেখিয়ে বেড়াবে এই বলছো তো? কিন্তু জানো না স্বপনদা, আলেয়াদি তেমন মেয়ে নয়। একটুও রূপের গর্ব তার নেই।

ভাই-বোন মিলে যখন তর্কবিতর্ক চলছিলো তখন বনহুর ওদের অলক্ষ্যে চট্ করে সোফা থেকে ভাঁজ করা কাগজের টুকরাটা তুলে নেয় হাতে। তখনকার মত রেখে দেয় পকেটে, তারপর এসে বসে ওদের পাশে, হেসে বলে বনহুর—কি ব্যাপার বলো তো?

কল্পনা বলে—দেখো তো রঞ্জন দা, ও বিশ্বাসই করতে চায় না।

কি বিশ্বাস করতে চায় না স্বপন?

আমি বলছি, মাসুমা বৌদির চেয়ে আলেয়াদি অনেক বেশি সুন্দরী। জানো রঞ্জনদা, ও বলছে তাহলে অমন ভূতের মত বোরখা পরে বেড়াতো না।

ও ঠিকই বলেছে কল্পনা। সত্যিই তো বোরখা ব্যবহার করে কারা—যারা কুৎসিৎ কদাকার তারাই। সুন্দরী আর রূপসী হলে তারা নিজেদের অমন করে ঢেকে রাখবে কেন? মানুষ তো আর রাক্ষস না যে দেখলেই খেয়ে ফেলবে?

অভিমান-ভরা কণ্ঠে বলে কল্পনা—আলেয়াদি নিজেকে বোরখার আবরণে ঢেকে রাখে লোকদের চোখ ঝলসে যাবে বলে। তারপর রাগ করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

স্বপন ঠোঁট উল্টে বলে—গেলো তো বয়েই গেলো। যাকে আজ পর্যন্ত একবার দেখতে পেলাম না, তার আবার রূপের প্রসংসা। লোকেই যদি ওর রূপ না দেখলো তবে কি হবে ও রূপ দিয়ে। আরে ছোঃ....

স্বপনের কথায় হাসলো বনহুর, বললো—দ্রাক্ষাফল খেতে না পেলে টক্ই হয়। তেমনি সুন্দর জিনিস্ দেখতে না পেলে কুৎসিতই মনে হয় স্বপন।

তুমিও দেখছি কল্পনার দিকে ঝুকে পড়লে রঞ্জনদা, যাই বলো মেয়েদের বোরখা পরা আমার একেবারে সহ্য হয় না।

তুমি জানো না স্বপন, মুসলমান হাদিসে আছে—মেয়েরা অপর পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখবে।

আর যদি আড়াল না করে?

পাপ হবে।

বাঃ বাঃ চমৎকার কথা! ওরা বোরখা পরে নিজেদের শরীর ঢাকা দিয়ে রাখবে আর বোরখার ছিদ্র দিয়ে পুরুষদের ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে দেখবে, তাতে বুঝি পাপ হয় না? তার চেয়ে বোরখা পরে অন্দর মহলে বসে থাকবে, তবেই না মুসলিম নারী। হাঁ, অমন কত বোরখা-পরা যেয়ে দেখেছি—সব কিছু শয়তানি ঐ বোরখার নীচে.....

বনহুর সিগারেট ধরালো, মুখে তার মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। মিথ্যা বলেনি স্বপন। বোরখা-পরা মেয়েদের মধ্যে যত নষ্টামি রয়েছে, তত নেই সাধারণ মেয়েদের। কারণ সাধারণ মেয়েরা চলাফেরা করবে স্বাভাবিকভাবে। তাদের চাল-চলন হবে স্বাভাবিক। বোরখা পরতে গেলেই তাদের ভিতরে থাকবে অপ্রকাশিক এক গোপনতা। পুরুষদের দৃষ্টি বার বার অন্বেষণ করে ফিরে ঐ বোরখার নীচে। একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বলে বনহুর—স্বপন, তোমার সঙ্গে আমার একমত।

স্বপন খুশীতে লাফিয়ে উঠে, করমর্দন করে সে বনহুরের, তারপর কথাটা ছোট বোন কল্পনাকে জানানোর জন্য দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

বনহুর হস্তস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে পকেট থেকে বের করে ভাঁজ করা কাগজের টুকরাখানা। মেলে ধরে আলোর সামনে। আঁকাবাঁকা কয়েক লাইন লেখা। লেখাটা কোনো নারীর বাম হস্তের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর পড়লো—

—হে বনের সৌন্দর্য,
বন ছেড়ে কেন তুমি
এই ইট-পাথরে গড়া
নগরের বুকে আশ্রয় গ্রহণ
করেছো? তোমার বিরহে
বনের পশু-পাখি যে
হাহাকার করে ফিরছে।
ফিরে যাও তোমার আবাসে,
যেখানে তোমার প্রতী-
ক্ষায় প্রহর গুনছে সবাই।

—বান্ধবী

একবার নয়, বার বার পড়লো বনহুর চিঠির টুকরাখানা। আশ্চর্য এ নারী, কে এই বান্ধবী যে তার সব কিছুই জানে? দেখতে হবে—বনহুরের চোখে ধূলো দেয় এমন জন আছে নাকি কেউ!

❑

কক্ষমধ্যে পায়চারী করে ফিরছে বনহুর।

গভীর রাত।

যে যার কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে বনহুর। রাত বেড়ে আসছে। বনহুর এবার তার ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করলো। পরে নিলো তার জমকালো ড্রেস। মাথায় কালো পাগড়ী। পাগড়ীর খানিকটা অংশ ঝুলছে বাম পাশে। ঐ অংশটা বনহুর মুখের নীচে গালপাট্টার মত জড়িয়ে নেয়। রিভলভারটা তুলে নিলো পকেটে।

আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর। অপূর্ব লাগছে নিজেকে। জমকালো ড্রেসটা তাকে অদ্ভুত সুন্দর করে তোলো। বনহুর বাম পাশে ঝুলানো কালো কাপড়ের অংশটা মুখে জড়িয়ে নিলো। বেরিয়ে এলো সন্তর্পণে।

❑

মনিরা জানে, বনহুর নিশ্চয়ই আসবে। তার চিঠিখানা অবশ্যই সে পেয়েছে। আরও ধোকা লেগেছে তার মনে। মনিরা নিজের মনেই হাসে, সে তার স্বামীকে নিয়ে এবার একটা মজার খেলা খেলবে। অনেক কাঁদিয়েছে বনহুর ওকে, এবার বনহুরকে মনিরা কিছুটা নাকানি-চুবানি খাওয়াবে।

মনিরা গোপনে হাশেম চৌধুরীর রিভলভারখানা এনে রেখেছে নিজের কাছে। রিভলভার আনলেও তাতে সত্যি কোনো গুলী ছিলো না।

এবার মনিরা কান পেতে শুনলো......পাশের কক্ষে হাশেম চৌধরী নাক ডাকছে। ঘুমিয়ে পড়েছে হাশেম চৌধুরী আর মাসুমা। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো সে, রাত দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট হয়েছে।

মনিরা পরে নিলো তার বোরখাটা, তারপর রিভলভার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ হয়ে।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে কেটে গেলো কয়েক মিনিট। মনিরা তবু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। এ কক্ষে কয়েকটা জানালা রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক জানালায় লোহার মজবুত শিক্ দেওয়া আছে। শুধু এ জানালাটায় কাচের শার্সী। মনিরা জানে, বনহুর এলে এ জানালা দিয়েই তার কক্ষে প্রবেশ করবে।

রিভলভার উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনিরা।

দেয়ালঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে বেজে চলেছে।

ঘড়ির কাঁটার শব্দের সঙ্গে মনিরার বুকের মধ্যেও ঢিপ্ ঢিপ্ করছিলো। স্বামীর দর্শনে সে যেন আত্মহারা না হয়, বিচলিত যেন না হয়ে পড়ে, সেজন্য নিজকে শক্ত করে নিচ্ছিলো।

হঠাৎ একটি শব্দ হলো খুট্ করে।

শব্দটা অত্যন্ত মৃদু।

সজাগ হয়ে দাঁড়ালো মনিরা, নিশ্চয়ই সে এসেছে। মনিরা নিজের বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন অনুভব করলো। স্তব্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলো মনিরা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভারখানা।

মনিরা রিভলভারখানা উদ্যত করে ধরে আছে, তার উপর নজর পড়তেই যেন প্রথম রিভলভারখানা চোখে পড়ে। মনিরা জানালার আড়ালে আত্মগোপন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময় জানালার শার্শী খুলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে সে, তারপর এগিয়ে যায় খাটের দিকে।

মনিরা লক্ষ্য করে বনহুরের কার্যকলাপ।

খাটের উপর তার কোলবালিশটা চাদর দিয়ে বেশ করে ঢেকে রেখেছিলো মনিরা।

বনহুর মনে করে, নিশ্চয়ই সেই বান্ধবী নামধারিনী মহিলা শুয়ে আছে বিছানায়। এবার জানতে পারবে সে—কে এই মহিলা।

সন্তর্পণে এগিয়ে যায় সে।

মনিরা রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে। মনিরার হস্তেও রিভলভার, কিন্তু রিভলভার গুলীশূন্য।

বনহুর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ায়।

রিভলভার উদ্যত রেখে সরিয়ে ফেলে চাদরখানা। মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চাদরখানা মেঝেতে।

অমনি মনিরা বনহুরের পিঠে তার ফাঁকা রিভলভারের মুখটা চেপে ধরে পিছন থেকে—খবরদার, একচুল নড়বে না।

বনহুর বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

মনিরা তীব্র কণ্ঠে বলে—দাও, রিভলভার আমার হাতে দাও।

বনহুর পিঠে রিভলভারের মুখের শক্ত চাপ অনুভব করে। বাধ্য হয়ে হাতের রিভলভারখানা তার সম্মুখে এগিয়ে ধরা হাতখানার উপরে রাখে।

মনিরা এবার বলে উঠে—বেরিয়ে যাও, যে পথে এসেছো ঐ পথে। খবরদার, আমার দিকে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করো না, সঙ্গে সঙ্গে গুলী করবো।

বনহুর যেন হকচকিয়ে যায়। এমন নিপুণ কৌশলে তাকে কে জব্দ করলো? তবে হাঁ, বান্ধবীই বটে, তাকে হাতের মুঠায় পেয়েও গ্রেফতার না করে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। বনহুর বললো—কে তুমি না দেখে আমি যাবো না।

বেশ, তাহলে মরতে রাজী আছো?

বনহুর মরতে ভয় করে না, তবে নারীর হস্তে সে মরতে রাজী নয়।

তবে সসম্মানে বেরিয়ে যাও। যাও বলছি, নইলে এক্ষুণি পুলিশ সুপার এসে পড়বেন।

বনহুর বিলম্ব না করে যে পথে এসেছিলো ঐ পথে অদৃশ্য হলো।

মনিরা হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ.......

বনহুরের কানে সে হাসির শব্দ যেন গরম সীসার মত জ্বালাময় মনে হলো।

মনিরা এবার তার বোরখা উন্মোচন করে ফেললো। নিজের হস্তের রিভলভারখানা শয্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর রিভলভারখানা চেপে ধরলো বুকে। গণ্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

❑

পরদিন মনিরা যখন ঘুম থেকে জাগলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। অবশ্য এতো বেলা ঘুমানোর কারণ আছে যথেষ্ট। প্রায় সমস্ত রাত্রি জেগেই কেটেছে মনিরার। বনহুর চলে যাবার পরও বহুক্ষণ ঘুমাতে পারে না সে।

ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিলো মাত্র, তাই জাগতে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

চায়ের টেবিলে বসে নানারকম গল্প শুরু হলো।

গত রাতে কল্পনাদের বাড়িতে বেড়ানো ব্যাপার থেকে রঞ্জন বাবুর পিয়ানো বাজানো সম্বন্ধে সব আলোচনাই চললো।

মনিরা কিন্তু সব কথায় ঠিকভাবে যোগ দিতে পারছিলো না। মনের মধ্যে নানারকম চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো ওর, তবু যোগ না দিয়ে উপায় ছিলো না। বিশেষ করে মাসুমা তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যস্ত করে তুলছিলো।

মাসুমা বললো হঠাৎ—ওগো, চলো না আজ আমরা আগ্রা তাজমহল দেখতে যাই? সত্যি, যত বার দেখি আরো যেন দেখবার সখ জাগে মনে। কি বলিস মনি, তাই না?

হাঁ। ছোট্ট জবাব দিলো মনিরা।

মাসুমা রাগতভাবে বললো—তুই বড্ড বুড়িয়ে গেছিস, মনিরা। বেশি কথা বলবি না। বেশি খাবি না, বেড়াবি না। সব সময় কেমন যেন ভাবগম্ভীর স্বভাব নিয়ে থাকবি।

হাশেম চৌধুরী হেসে বলেন—তোমার মত অমন রসিক মেয়ে তো সবাই নয়।

আমি বুঝি রসিক মেয়ে!

তা নয় তো কি? তোমার বান্ধবীর চেয়ে তুমি বড্ড ছেলেমানুষী করো।

যাও আর কথা বলবো না বা কোথাও বেড়াতে যাবো না। তোমার সঙ্গে আড়ি......

আঃ বাঁচলাম তাহলে।

কিন্তু বাঁচতে তোমাকে দেবো না আমি।

তার মানে?

মানে রঞ্জন বাবুকে বলেছি, তিনি নিয়ে যাবেন আমাদের। আর তুমি যাবে আমাদের পাহারাদার হিসেবে।

সবাই এবার হেসে উঠলো হো হো করে।

মনিরাও জোরে হেসে উঠলো এবার।

মাসুমা বললো—দেখলে আমার বান্ধবী নাকি হাসতে জানে না, এবার দেখলে তো?

❑

বিকেলে হাশেম চৌধুরী সপরিবারে আগ্রার দিকে রওয়ানা দিলেন। স্বপন, কল্পনা আর রঞ্জন বাবুও সঙ্গে রইলো তাদের। আর রইলো কয়েকজন সশস্ত্র পুলিস ফোর্স।

হাশেম চৌধুরীর নিজস্ব কারেই রওয়ানা দিলো সবাই মিলে।

পিছনে চললো পুলিশ ভ্যান।

এক সময় বনহুর হেসে বললো—মিঃ চৌধুরী, পুলিশ ফোর্স নিয়েছেন ব্যাপার কি? ডাকু গ্রেফতারে চলেছেন নাকি?

হাশেম চৌধুরী বললেন—সাবধানতা রক্ষার জন্য ওদের সঙ্গে নিলাম রঞ্জন বাবু। হঠাৎ যদি.....

রাত্রির ভয়ঙ্কর হামলা দিয়ে বসে, তাই?

হাঁ, আপনি ঠিক্ বলেছেন রঞ্জন বাবু। সত্যি, আমি অবাক হয়ে গেছি এই রাত্রির ভয়ঙ্করের অদ্ভুত কার্যকলাপে। শত শত পাহারার মধ্যেও এই দস্যু তার কাজ ঠিকভাবে করে চলেছে।

মনিরা, মাসুমা আর কল্পনা বসেছিলো পিছনের আসনে। সম্মুখে বসেছিলেন হাশেম চৌধুরী আর স্বপন। ড্রাইভারের কাজ করছিলো রঞ্জনবেশী দস্যু বনহুর।

অবশ্য ইচ্ছা করেই বনহুর নিজে নিয়েছিলো এই ভারটা।

আজও মনিরার শরীরে বোরখা আবৃত ছিলো। বনহুরের মিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার অন্তরে এক আনন্দ উৎসব বইয়ে দিচ্ছিলো। নিশ্চুপ বসে শুনছিলো সব। রাত্রির ভয়ঙ্কর যে অন্য কেহ নয় তা বেশ উপলব্ধি করছিলো মনিরা। তার স্বামী যে রাত্রির ভয়ঙ্কর নাম ধারণ করে দিল্লী নগরী তোলপাড় করে তুলেছে—একথা কেউ না জানলেও জানে সে। হাশেম চৌধুরীর কথায় বনহুরের টিপ্পনি-ভরা বাক্যগুলো শুনে মনে মনে হাসছিলো মনিরা। সুচতুর স্বামীর কার্যকলাপ সে নিপুণভাবে লক্ষ্য করে চলেছে। সুদূর ভারতে এসেও সে তার স্বভাব ত্যাগ করতে পারেনি।

অনেক কথাই ভাবছিলো মনিরা, স্বামীকে এতো কাছে পেয়েও না পাওয়ার ব্যথা যে কত গভীর তা একমাত্র মনিরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না।

মাসুমা বললো হঠাৎ—আচ্ছা রঞ্জন বাবু, একটা কথা বলবো?

বলুন? একটা কেন যত খুসী বলুন আপনি। গাড়ির হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো বনহুর।

মাসুমা বললো—রঞ্জন বাবু, আপনার জন্মভূমি কি এই দিল্লী নগরী?

বললো বনহুর—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মিসেস চৌধুরী?

আমি জানতে চাই আপনি আসল দিল্লীবাসী কিনা?

মনিরাই অবশ্য মাসুমাকে এ প্রশ্ন করবার জন্য তার কানে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বলে দিয়েছিলো।

বনহুর বুঝতে পারে—বোরখাধারিনীই এ প্রশ্নের জন্য দায়ী—মাসুমা নয়। বলে বনহুর—আমার জন্মভূমির সঠিক সন্ধান আমি জানি না। তবে সমস্ত পৃথিবীটাই আমার জন্মভূমি—এই জানি।

হেসে উঠেন হাশেম চৌধুরী, স্বপন আর কল্পনা।

হাশেম চৌধুরী বলে উঠেন—ঠিক বলেছেন রঞ্জন বাবু। মনে পড়ে কোনো এক কবি বলেছিলেন—

বিশ্ব আমার জন্মভূমি।
বিশ্ব আমার মা—
বিশ্ব মায়ের চরণ সেবায়
বিলিয়ে দেবো গা,

মাসুমা বললো আবার—অমন সোজা উত্তর সবাই দিতে জানে রঞ্জন বাবু। আপনি যে বাংলাদেশের সন্তান নন, এ কথা আমি জানি।

চমকে উঠে বনহুর, তবে কি বোরখাধারিনী তার পরিচয় প্রকাশ করেছে মিসেস চৌধুরীর কাছে? অসম্ভব কিছু নয়, এতো যখন ঘনিষ্ঠতা, তখন না বলার কোনো কারণ নেই। তবে এটুকু সান্ত্বনা—হাশেম চৌধুরী এখনও জানেন না এ সব কিছু। জানলে নিশ্চয়ই তিনি তার সঙ্গে এমনভাবে মিশতে পারতেন না। কে এই মহিলা—একবার নয়, দু'বার সে তাকে জব্দ করে দিয়েছে? পুরুষ নয়—একটা নারীর কাছে তার চরম অপমান!

কি ভাবছেন রঞ্জন বাবু? বললো মাসুমা।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো বনহুর—বাংলাদেশে বাস করি। বাংলা কথা বলি। তবু আমি বাঙালীর সন্তান নই—আশ্চর্য! আফসোস, আজও আমি নিজের পরিচয় নিজেই জানি না।

হাশেম চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন—স্বপন আর কল্পনা তবে.......

যদিও আমার মার গর্ভে তাদের জন্ম হয়নি তবু ওরা আমার ঠিক সহোদরের মত।

এ-কথা সে-কথার মধ্যে গাড়ি এক সময় তাজমহলের অদূরে এসে থামলো।

গাড়ি থেকে বনহুর নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো। বললো সে—নামুন।

মাসুমা নামলো।

কল্পনাও নেমে দাঁড়ালো এবার।

মনিরা নামবার সময় ইচ্ছা করেই তার হাতখানা না জানার ভান করে বনহুরের হাতের উপর রাখলো।

বনহুর চট্ করে তার নিজের হাতখানা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। মনিরার হাতখানা তখনও তার হাতের উপর বেশ চেপে রয়েছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে হাতখানা লক্ষ্য করলো মুহূর্তের জন্য—হাঁ সুন্দরী বটে—হাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। দুগ্ধ ধবল সুকোমল একটি হাত।

হাশেম চৌধরী নেমে পড়ে বললেন—চলে এসো তোমরা।

সবাই অগ্রসর হলো তাজমহলের দিকে।

হঠাৎ বনহুরের মনটা বেদনায় চড়াৎ করে উঠলো। মনে পড়লো একদিনের কথা.....সে আর লুসী পাশাপাশি এই পথ ধরে এগুচ্ছিলো সেদিন। ক'দিনের পরিচয়ে লুসী তাকে কত আপন করে নিয়েছিলো.....

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। মনিরা ঠিক তার পাশে পাশে এগিয়ে চলছিলো। মাসুমা ছিলো একটু আগে।

হাশেম চৌধুরী, স্বপন আর কল্পনা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

মনিরা হোচট্ খেয়ে পড়ে যায় ভূতলে, আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে—উঃ মাগো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ধরে ফেলে।

স্বামীর বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়ায় মনিরার সমস্ত দেহটা যেন অবশ শিথিল হয়ে আসে। শিরায় শিরায় বয়ে যায় এক অপূর্ব আনন্দদ্যুতি।

মাসুমা ততক্ষণে ধরে ফেলেছে মনিরাকে, রাগত কণ্ঠে বলে সে—এতো করে বললাম বোরখা পরার ঢং ত্যাগ কর, তবু বোরখা ছাড়বে না—-এবার হলো? দেখি কোথাও চোট্ লেগেছে কিনা?

বনহুর আর মাসুমার হাতের মধ্য হতে মনিরা নিজেকে সংযত করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে সে—না না, আমার কিছু হয়নি।

আবার চলতে শুরু করে ওরা।

মনিরার মনেও একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। কিন্তু না, কিছুতেই এতো সহজে ধরা দেবে না সে ওকে।

তাজমহলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সবাই মিলে।

স্বপন ক্যামেরা এনেছিলো সঙ্গে; ছবি তুললো কয়েকটা। তারপর আবার সকলে মিলে অগ্রসর হলো তাজমহলে।

তাজমহলের প্রথম সোপানে এসে দাঁড়াতেই একজন সকলের জুতো খুলে নিলো। হাশেম চৌধুরী সাহেবী ক্যাপ পরে গিয়েছিলেন, তার ক্যাপটাও নিয়ে রাখলো সে।

বনহুরের শরীরে ছিলো সাধারণ ড্রেস। শুধু স্যুট পরেছিলো, কোনো টুপী বা হ্যাট ছিলো না তার মাথায়। কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না।

সমস্ত তাজমহলটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো সবাই মিলে।

যদিও তারা আরও কয়েকবার এসেছে এখানে, তবু তাজমহল দেখার বাসনা তাদের প্রত্যেকের প্রবল রয়েছে। শ্বেত পাথরের তৈরি মমতাজের স্মৃতিসৌধ যেন নতুন হয়ে ফুটে উঠে তাদের চোখে।

সমস্ত তাজমহলটা দেখা শেষ করে পিছন দিকে যমুনার উপরে এসে দাঁড়ায় সবাই। বেলাশেষের অস্তগামী সূর্য তখন যমুনার নীল জলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট পালতোলা নৌকাগুলে হাওয়ায় তর তর করে ভেসে চলেছে।

তন্ময় হয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছিলো মাসুমা আর মনিরা।

হাশেম চৌধুরী, স্বপন আর কল্পনা এগিয়ে গেছে ওদিকে আরও কিছুটা।

মনিরা রেলিং-এর উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো।

মাসুমাও কখন যে সরে গেছে তার পাশ থেকে, কিছু খেয়াল করেনি মনিরা।

হঠাৎ একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো মনিরা নিজের হাতের উপর, সঙ্গে সঙ্গে চাপা মৃদু কণ্ঠস্বর—বান্ধবী, নিজেকে এমনভাবে আড়াল করে রাখলেও বেশিদিন আপনি আমার কাছ থেকে গোপন থাকতে পারবেন না।

মনিরা বোরখার আড়ালে মৃদু হাসলো, কোনো জবাব দিলো না। বনহুর দ্রুত সরে গেলো কিছুটা, তারপর সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

বনহুর যখন মনিরার পাশে গিয়ে ফিস ফিস করে কথাগুলো বলছিলো, তখন কেউ লক্ষ্য না করলেও মাসুমা একটু আঁচ করে নিয়েছিলো। এবং চমকে উঠেছিলো সে। কারণ রঞ্জন বাবুর সঙ্গে মনিরার কোনো রকম পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা নেই। রঞ্জন বাবু মনিরাকে কি বললেন তবে?

মনিরার পাশে এলো মাসুমা, বললো—চল্ ফেরা যাক্।

মনিরা বললো—হাঁ চল্ মাসুমা।

হাশেম চৌধুরী, কল্পনা আর স্বপনসহ বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন। মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু আলোচনা করছিলেন।

বনহুর মাসুমা আর মনিরা এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে।

বললো বনহুর—মিঃ চৌধুরী, চলুন এবার।

বেড়ানো হলো তোমাদের? মাসুমাকে লক্ষ্য করে বললেন হাশেম চৌধুরী।

এবার কথা বললো মনিরা—রাত্রির ভয়ঙ্কর হঠাৎ হামলা দিয়ে বসতে পারে!

মাসুমা চমকে উঠলো, এতোক্ষণ তার মনেই ছিলো না এ কথাটা। বললো সে—সত্যি বলেছে মনি.....

মনিরা সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলো মাসুমার গায়ে।

মাসুমা অমনি মুখটা বিকৃত করে বলে উঠলো—মানে আলেয়া যা বললো একেবারে সত্যি! তাই তো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, হঠাৎ রাত্রির ভয়ঙ্কর হামলা করে বসতে পারে।

হাঁ, নির্ঘাৎ সত্যি, এভাবে বাইরে রাত্রি করা মোটেই উচিৎ হবে না। চলুন, এবার যাওয়া যাক। কথাটা বললো রঞ্জনবেশী দস্যু বনহুর।

মনিরা বোরখার অন্তরালে হাসলো!

গাড়ির পাশে যখন ওরা ফিরে এলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

হাশেম চৌধুরী পুলিশগণকে আদেশ দিলেন তারা যেন সতর্কভাবে লক্ষ্য রেখে তাদের সঙ্গে চলে।

গাড়িতে বসে বললো মাসুমা—এতোগুলো পুলিশ রয়েছে, সাধ্য কি রাত্রির ভয়ঙ্কর আমাদের গাড়ির আশেপাশে আসে।

মনিরা মৃদুস্বরে বললো—রাত্রির ভয়ঙ্করের অসাধ্য কিছু নেই; হয়তো সে আমাদের গাড়িতেও থাকতে পারে।

বলো কি? বললো মাসুমা।

হাঁ। মনিরা বললো আবার।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে বসে সব শুনলো, তার মুখেও ফুটে উঠলো একটা হাসির রেখা।

হাশেম চৌধুরী বললেন—রাত্রির ভয়ঙ্করের সাধ্য কি আমার গাড়ির পাশে আসে।

এবার অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ.......

আশ্চর্য হলো সবাই।

চমকে উঠলো মনিরা।

হাশেম চৌধুরী অবাক কণ্ঠে বললো—ব্যাপার কি রঞ্জন বাবু?

বনহুর হাসি বন্ধ করে বললো—অহেতুক আপনাদের আশঙ্কা দেখে আমার হাসি পেলো, তাই।

মাসুমা বললো—আপনি বীর পুরুষ কিনা, তাই আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

বনহুরের হাতে গাড়িখানা তখন উল্কাবেগে ছুটে চলেছে।

❑

বনহুর সে রাতে বাসায় ফিরে বেশ উত্তেজনা বোধ করলো নিজের মনে। বোরখাধারিনী যে তার সব কিছুই জানে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতো জেনেও সে তার কথা আজও কাউকে বলেনি কেন। এমনকি পুলিশ সুপার তার আত্মীয়—তাকেও জানায়নি সে। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ বোরখার নীচে।

অনেক রাত।

বনহুর পায়চারী করছে মেঝেতে।

ললাটে তার চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

বনহুর যখন কক্ষমধ্যে পায়চারী করছে তখন একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো তার কক্ষের বাহিরে জানালার পাশে। বোরখায় আবৃত তার সমস্ত দেহ।

বোরখা আবৃত ছায়ামূর্তি অন্য কেহ নয়—মনিরা। সে গোপনে বেরিয়ে এসেছে বাংলো থেকে, সন্ধান নিতে স্বামীর। মনিরা বুকে সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে, দুর্গম পথে পা—বাড়াতে এখন তার কোনো ভয় নেই।

মনিরা কোনোদিন দুঃসাহসিনী ছিলো না। ইদানিং তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত সাহস দানা বেঁধে উঠেছে। সে স্বাভাবিক নারী বটে, কিন্তু তার স্বামী অস্বাভাবিক পুরুষ; কাজেই তাকেও হতে হবে অস্বাভাবিক নারী, না হলে স্বামীকে সে কোনোদিন জয় করতে পারবে না।

মনিরা সেদিন প্রথম স্বামীকে দেখার পর নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারছিলো না। একটা অদ্ভুত আলোড়ন তাকে চঞ্চল করে তুলেছিলো। ইচ্ছা হচ্ছিলো তখনই ছুটে গিয়ে স্বামীর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে, কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসংযত করে নিয়েছিলো মনিরা সেদিন। না, এতো সহজেই তাকে ধরা দেবে না সে। গোপনে সন্ধান নেবে—এই সুদূর দিল্লী নগরীতে কি উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনিরা অশিক্ষিত নারী নয়, সে উচ্চশিক্ষিতা—এতোটুকু ধৈর্য যদি সে না ধারণ করতে পারে তাহলে চলবে কি করে।

মনিরা তার দস্যুস্বামীকে এবার পরীক্ষা করে দেখবে। তাই সে দুঃসাহসে বুক বেঁধে এ পথে অগ্রসর হয়েছে।

বনহুর যখন কক্ষমধ্যে পায়চারী করছিলো তখন মনিরা তার কালো বোরখার মধ্য থেকে সব লক্ষ্য করছিলো। বনহুর প্রবেশ করলো ড্রেসিংরুমে। মনিরা তখন অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলো কক্ষে, বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বালিশটা উঁচু করতেই নজরে পড়লো রিভলভারখানা। মনিরা দ্রুতহস্তে রিভলভারখানা তুলে নিলো হাতে।

তারপর আলমারীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রতীক্ষা করছিলো ড্রেসিংরুম থেকে কখন বের হবে বনহুর।

কিছুক্ষণ পর বনহুর বেরিয়ে এলো ড্রেসিংরুম থেকে। সমস্ত দেহে জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী। বনহুর এবার বিছানার পাশে এসে বালিশটা সরিয়ে ফেললো। বিস্ময়ে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন! বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে।

অমনি নারীকণ্ঠে হাস্যধ্বনি হলো—হাঃ হাঃ হাঃ.......

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

বোরখাধারিনীর হস্তে উদ্যত রিভলভার লক্ষ্য করলো। চোখ দুটো বনহুরের আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো মুহূর্তে। নারীকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো—হ্যাণ্ডস আপ।

স্বামীকে নিয়ে মনিরা তামাসা করছে।

বনহুর জানে না এ বোরখাধারিনী কে। সে ধারণাও করতে পারে না, সুদূর কান্দাই থেকে মনিরা আসতে পারে এখানে। মনিরার কণ্ঠ যদিও তার পরিচিত কিন্তু এখন তার মনিরার কণ্ঠ সম্বন্ধে কোনোরকম কল্পনা করা সম্ভব নয়। কাজেই বনহুরের কাছে মনিরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

মনিরার অনুরোধেই হাশেম চৌধুরী তাদের দেশ কোথায় কাউকে জানাননি। যদিও তিনি এ ব্যাপারে আশ্চর্য হয়েছেন তবু স্ত্রীর বান্ধবীর অনুরোধ অমান্য করতে পারেননি। হাশেম চৌধুরীর দেশের সন্ধান তাই সর্বসাধারণের অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এমনকি তার বাংলোর বয়-বাবুর্চিং— এরাও জানে না হাশেম চৌধুরীর জন্মভূমির সন্ধান।

বনহুর ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো।

রাগে গস্ গস্ করছে বনহুর, বোরখাধারিনীর দুঃসাহস দেখে অবাকও হয়েছে সে।

বললো বনহুর—বান্ধবী, কি চাও তুমি আমার কাছে?

মনিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ভান করে বললো—তোমার দস্যুতার সমাপ্তি করতে চাই।

হাঃ হাঃ হা—অট্টহাসি হেসে উঠলো বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—বান্ধবী, তোমার ভয়ে আমি দস্যুতা ত্যাগ করতে রাজী নই। তোমার অনুরোধে আমি দস্যুতা পরিহার করতে রাজী আছি, যদি তুমি আমার কথায় রাজী হও।

বলো, কি বলতে চাও তুমি?

কে তুমি, তোমার আসল পরিচয় কি—জানতে চাই।

অসম্ভব! আমার পরিচয় আমি কাউকে জানাতে রাজী নই।

তাহলে আমিও তোমার কথা রাখতে পারবো না।

বনহুর কথার ফাঁকে অগ্রসর হচ্ছিলো ধীরে ধীরে, নিকটে পৌঁছে চট্ করে ওর হাতখানা ধরে ফেলবে—এই তার উদ্দেশ্য।

মনিরা স্বামীর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তাই সে সতর্ক করে বলে উঠে— খবরদার, এক পা এগুলে আমি তোমাকে গুলী করবো। পিছু হঠতে লাগলো মনিরা।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—স্বপন ওকে ধরে ফেলো। ধরে ফেলো—

মনিরা জানে, এটা বনহুরের মিথ্যা উক্তি। হেসে উঠে মনিরা—স্বপন এখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। বনহুর, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও.......কথা শেষ করে মনিরা ঘরের বাইরে গিয়ে চট্ করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আটকা পড়ে যায় বনহুর।

মনিরা তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।
ফিরে আসে মনিরা বাংলোয়।
শয্যা গ্রহণ করে সে, মনে তার অফুরন্ত আনন্দ—দস্যু স্বামীকে সে ভীষণভাবে জব্দ করে দিয়েছে। মনিরা শোবার সময় সমস্ত দরজা-জানালা মজবুতভাবে বন্ধ করে শোয়। কারণ, বনহুর যে-কোনোভাবে তার কক্ষে প্রবেশ করতে পারে, তাই সে সর্তকতা অবলম্বন করে।
আজকাল শহরে রাত্রির ভয়ঙ্করের উৎপাত অনেক কমে এসেছে বটে কিন্তু আশঙ্কা কমেনি এখনও। সদা ভয় আর দুর্ভাবনা নিয়ে কাটায় নগরবাসী।
সেদিন মাসুমা, মনিরা আর হাশেম চৌধুরী বাগানে বসে চা পান করছিলেন, এমন সময় ব্যস্তভাবে একজন পুলিশ এসে সেলুট্ করে দাঁড়ালো, তারপর বললো—স্যার, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরী দরকার আছে।
হাশেম চৌধুরী বললেন—মাসুমা, তোমরা ভিতরে যাও, ওকে এখানেই ডাকি।
মাসুমা আর মনিরা উঠে দাঁড়ালো, কারণ তাদের চা পান শেষ হয়ে গিয়েছিলো।
ওরা চলে যেতেই হাশেম চৌধুরী পুলিশকে বললো—যাও তাকে এখানে নিয়ে এসো।
পুলিশটা চলে গেলো।
অল্পক্ষণ পর ফিরে এলো—সঙ্গে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। মুখমণ্ডল তার ভয়ে বিবর্ণ, দুরু দুরু বক্ষে এসে আদাব জানালো।
হাশেম চৌধুরী বললেন—বসুন।
মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করে প্রায় কেঁদেই ফেললেন।
হাশেম চৌধুরী বললেন—বলুন কি বলতে চান?
ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে হাশেম চৌধুরীর হাতে দিলেন।
হাশেম চৌধুরী কাগজখানা হাতে নিয়ে খুলে ফেললেন, তারপর পড়লেন—ভানুসিং, আজ রাত্রে চার ঘটিকায় আমি আসবো। এক শত ভরি সোনা আমার জন্য মজুত রাখবে। ঠিক্ তোমার শয়নকক্ষে দেখা করবো।
চিঠিখানা বার দুই পড়ে নিয়ে পকেটে রাখলেন পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী। বললেন তিনি—রাত্রির ভয়ঙ্কর হঠাৎ আপনার কাছে সোনা চেয়ে বসবে—এর কারণ কি?
হাম্‌ভী কুছু সমঝতা নেহি বাবুজি। তব হামারা সোনা কি দোকান ন্যায়, উছিসে ডাকু হামারা পাশ সোনা কি জলুম কিয়া।

হাঁ ঠিক্ বলেছেন, তা আপনি কি রাজী আছেন এতে?

নেহি বাবুজী। হাম্ মর যায়েগা একশো ভরি সোনে হাম্ কাঁহাছে দেগা বাবুজী!

আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। এক শো ভরি সোনা দেবার জন্য স্বীকার হয়ে যান এবং আপনার কক্ষে সেভাবে তৈরি থাকবেন।

ইয়া আপ্ কেইছে বাৎ কহিতেছেন বাবুজী? হাম্ একশো ভরি সোনে দিবে তব্ কেইছে বাঁচেগা----

আপনাকে বাঁচানোর জন্যই তো এতো করছি। আপনি ঠিক্‌ভাবে তৈরি থাকবেন কিন্তু সোনা আপনার খোয়া যাবে না।

বাবুজি!

হাঁ, আপনার কক্ষের আশেপাশে গোপনে লুকিয়ে থাকবে আমার পুলিশ ফোর্স।

হাঃ হাঃ হাঃ সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স.......ব্যাপার কি মিঃ চৌধুরী? কথাটা বলতে বলতে এগিয়ে এলো রঞ্জন।

আরে রঞ্জনবাবু যে, আসুন—আসুন......

রঞ্জনবেশী দস্যু বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

বললেন হাশেম চৌধুরী—শুনুন, আজ আবার নতুন খবর।

নতুন খবর?

হাঁ, এই দেখুন.....হাশেম চৌধুরী প্যান্টের পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে রঞ্জনবাবুর হাতে দিলেন—পড়ে দেখুন আপনি।

বনহুর চিঠিখানা মনোযোগ সহকারে পড়ে নিয়ে বললো—আশ্চর্য, রাত্রির ভয়ঙ্করের চিঠি এটা!

এবার বুঝতে পারছেন কেন সশস্ত্র পুলিশের প্রয়োজন।

হাঁ, এবার সব বুঝতে পারলাম। চিঠিখানা ফেরৎ দিলো রঞ্জন।

হাশেম চৌধুরী চিঠিখানা পকেটে ভাঁজ করে রেখে বললেন—এবার বলুন রঞ্জনবাবু, কিভাবে রাত্রির ভয়ঙ্করের কবল থেকে বেচারীকে বাঁচানো যায়!

আবার হাসলো বনহুর—অসংখ্য পুলিশ ফোর্স থাকতে দুশ্চিন্তার কারণ নেই মিঃ চৌধুরী।

তা অবশ্য ঠিক্ বলেছেন। শুধু পুলিশ ফোর্সই থাকবে না রঞ্জন বাবু, আমি নিজেও থাকবো। আর আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন!

এটুকুরই প্রতীক্ষা করছিলো বনহুর, তবু বললো সে—আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?

আপনি যা পারেন অনেকেই তা পারে না রঞ্জন বাবু। আপনার পিয়ানোর সুর রাত্রির ভয়ঙ্করের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে।

বেশ, তাহলে তাই হবে।

সত্যি রাজী আছেন আপনি, ঐ দিন থাকবেন আমার সঙ্গে?

আপনার অনুরোধ না রেখে পারি!

এরা যখন বাগানে বসে রাত্রির ভয়ঙ্কর সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা করছিলো তখন মনিরা ও মাসুমা ওপাশে আড়ালে বসে সব কথাবার্তাই শুনছিলো।

মুহূর্তে মুহূর্তে মনিরার মুখোভাবে পরিবর্তন আসছিলো।

যখন হাশেম চৌধুরী আর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক রাত্রির ভয়ঙ্করের চিঠির ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিলো তখন মনিরা আঁচ করে নিয়েছিলো সমস্ত ঘটনাটা। রাত্রির ভয়ঙ্কর যে তারই প্রিয়তম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর যখন স্বয়ং রঞ্জন বাবু এসে উপস্থিত হলো তখন তার চোখেমুখে হঠাৎ একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিলো।

মাসুমা লক্ষ্য করেছিলো মনিরার মুখোভাব। রঞ্জন বাবুর আগমনে মনিরার চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো। ভাবে মাসুমা, তবে কি তার বান্ধবীর মনে রঞ্জন বাবু রেখাপাত করেছে। পরপর কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে তার। প্রথম পিয়ানোর সুর মনিরার অন্তরকে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিলো। সেদিন মনিরার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলো মাসুমা অদ্ভুত এক অস্বাভাবিকতা। তারপর আরও কয়েকদিন মাসুমা মনিরার মধ্যে দেখতে পেয়েছে ঐ রকম তন্দ্রাচ্ছন্নভাব। রঞ্জন বাবু সুন্দর সুপুরুষ, তাই বলে মনিরা....না না, এ কি করে সম্ভব হবে, মনিরা যে বিবাহিতা। শুধু তাই নয়—তার স্বামী আছে, সন্তান আছে।

মনে পড়ে মাসুমার সেদিনের কথা—আগ্রায় যেদিন তারা তাজমহল দেখতে গিয়েছিলো। সকলের অলক্ষ্যে রঞ্জন বাবু মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু যেন চাপা স্বরে বলেছিলো স্পষ্ট স্মরণ আছে তার। আজও মাসুমা মনিরার মুখোভাব তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল করছিলো। রঞ্জনবাবুর কণ্ঠস্বর তার অন্তরে যেন সুধা বর্ষণ করে চলেছে।

মাসুমা বললো হঠাৎ—মনিরা, একটা কথা বলবো, সঠিক জবাব দিবি?

মনিরা তখন তন্ময় হয়ে হাশেম চৌধুরী আর রঞ্জন বাবুর কথাবার্তা শুনছিলো। মাসুমার প্রশ্নে সজাগ হয়ে সোজা হয়ে বসলো, বললো সে—নিশ্চয়ই দেবো।

আচ্ছা মনিরা, রঞ্জনবাবুকে তোর কেমন লাগে?

অনেক ভাল।

তাকে না তার পিয়ানোর সুর?

মাসুমা, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিস রঞ্জনবাবুকে আমার কেমন লাগে, তার পিয়ানোর সুর নয়।

হাঁ।
কোন্ টা?
রঞ্জনবাবু না তার পিয়ানোর সুর?
হাঁ, দুটোই আমার খুব ভাল লাগে!
মনিরা!
জানি এ আমার অন্যায়, তবুও.....
মাসুমা গম্ভীর হয়, কোনো কথা বলে না।
মনিরা বলে—চল্ ভিতরে যাই।
চল্। উঠে দাঁড়ায় মাসুমা।

❑

এতো সতর্ক পাহারা থাকা সত্ত্বেও সেদিন মাড়োয়ারীর বাড়িতে রাত্রির ভয়ঙ্কর হানা দিয়ে একশত ভরি সোনা হরণ করে নিয়ে গেছে। পুলিশ সুপার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, ছিলো রঞ্জনবাবু আর ছিলো অগণিত পুলিশ ফোর্স।

গভীর রাতে এতো কড়া পাহারার মধ্যেও জমকালো পোশাক পরা রাত্রির ভয়ঙ্কর গুলীভরা রিভলভার নিয়ে হানা দেয়।

এতোগুলো পুলিশ বাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে গভীর রাতে একেবারে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের শোবার কক্ষে হাজির হয় রাত্রির ভয়ঙ্কর।

একশত ভরি সোনা অবশ্য ছিলো না, তবু প্রায় সত্তর ভরি সোনা ছিলো আর ছিলো পঞ্চাশ হাজার টাকা। সব লুটে নিয়েছে রাত্রির ভয়ঙ্কর।

পাশের কামরাতেই ছিলেন পুলিশ সুপার আর রঞ্জনবাবু।

জেগেই ছিলো তারা, মাঝে মাঝে চা পান করছিলো। এক সময় চা পান করে হাশেম চৌধুরী ঝিমিয়ে পড়লেন, কেমন যেন তার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগলো। কিছুতেই জেগে থাকতে পারলেন না। এক সময় সোফার উপর ঢলে পড়লেন তিনি।

ভোর বেলা জেগে উঠলেন্ হাশেম চৌধুরী মাড়োয়ারী ভদ্র-লোকের আকুল আর্তনাদে—বাবুজী হাম্ খতম্ হুগিয়ে। ডাকু হামারা সব লুট লেগিয়ে। বাবুজী ...বাবুজী...

ধড়মড় করে জেগে সোজা হয়ে বসলেন হাশেম চৌধুরী, বিস্ময়ে হতবাক হলেন, কখন সে এভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বুঝতেই পারেনি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলো পাশের সোফায় রঞ্জনবাবু দিব্য আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

হাশেম চৌধুরী—তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন — রঞ্জনবাবু, রঞ্জনবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

জেগে উঠে রঞ্জনবাবু, কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো।

বললো হাশেম চৌধুরী—আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে রঞ্জনবাবু।

এ্যাঁ বলেন কি! ডাকু এসেছিলো তাহলে?

হাঁ বাবুজী, ডাকু মেরা সব কুচ্ লেগিয়ে ..মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

রঞ্জনবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লো, দুঃখিতভাবে বললো—হায়, কখন এমনভাবে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

বললো হাশেম চৌধুরী—আমিও ঠিক্ তাই ভাবছি। ঠিক্ আমাদের চায়ে কিছু মেশানো হয়েছিলো, না হলে এমনভাবে আমরা দু'জনা ঘুমিয়ে পড়তাম না।

হাশেম চৌধুরী তক্ষুণি পুলিশদের আদেশ করলেন—রাতে যারা চা তৈরি করেছিলো সেই সব বয় আর রান্নার বামুন ঠাকুরদের গ্রেফতার করো।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাড়োয়ারী বয় আর বামুন ঠাকুর যে রাতে চা তৈরি করেছিলো তাকে গ্রেফতার করা হলো।

অনেক কান্নাকাটি করা সত্তেও হাশেম চৌধুরীর কড়া আদেশ শিথিল হলো না।

শহরে এ-ব্যাপার নিয়ে বেশ তোলপাড় শুরু হলো। স্বয়ং পুলিশ সুপার এবং অগণিত পুলিশ ফোর্স সতর্ক পাহারারত থাকা সত্তেও মাড়োয়ারী বাড়ি রাত্রির ভয়ঙ্কর হানা দিয়ে বহু সোনা ও অর্থ হরণ করে নিয়ে গেছে।

পুলিশ রাত্রির ভয়ঙ্করের কিছু করতে পারেনি।

কথাটা হাশেম চৌধুরীর মনে খুব করে লাগলো। এবার সে রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতারে কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন। যেমন করে হোক তাকে গ্রেফতার করতেই হবে।

❑

পরদিন বাংলোর ড্রইংরুমে বসে এসব ব্যাপার নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিলো। এতো সাবধানতা অবলম্বন করেও রাত্রির ভয়ঙ্করের কবল থেকে মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে রক্ষা করতে পারেননি বলে আফসোস করছিলেন হাশেম চৌধুরী।

বললেন তিনি —রঞ্জনবাবু , রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতার না করে আমি স্বস্তি পাবো না। শয়তান অত্যন্ত চতুর। সে জানতো—আমি এবং আপনি

মাড়োয়ারী বাড়ি রয়েছি, তাই কৌশলে বামুন ঠাকুর আর বয়কে হাত করে নিয়ে আমাদের চায়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিলো।

ঐ রকম আমারও মনে হয় মিঃ চৌধুরী। না হলে ওভাবে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি একটুও খেয়াল নেই।

এবার আমিও দেখে নেবো রাত্রির ভয়ঙ্কর কত চালাক।

নতুন কোনো কৌশল মাথায় এসেছে নাকি?

আসেনি, তবে নতুনভাবেই তাকে ফাঁদে ফেলবো।

হাঁ, সেই ভাল হবে। রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতার করে দক্ষ পুলিশ সুপার নামটা কিনে নেবেন—তাহলে এবার?

দেখি কতদূর পারি। বললেন হাশেম চৌধুরী।

❑

রাতে স্বামীকে খেতে দিয়ে বললো মাসুমা—খুবতো বড় বড় কথা বলেছিলে, কই পারলে রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতার করতে?

খেতে খেতে জবাব দিলেন হাশেম চৌধুরী—একবার পারিনি বলে হতাশ হবার লোক হাশেম চৌধুরী নয়, রাত্রির ভয়ঙ্করের চেয়েও ভয়ঙ্কর আমি।

হেসে উঠলো মাসুমা— সেতো দেখতেই পাচ্ছি। দুইবন্ধু মিলে গিয়েছিলে, খুব বড় বড় কথা বলেছিলে। রাত্রির ভয়ঙ্করের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছো —এইতো বড় কথা।

মাসুমা, হাশেম চৌধুরীকে আজও চেনো না। বাছাধন যাবে কোথা? এবার সঙ্গী-সাথী কেউ নয়, আমি একাই দেখবো রাত্রির ভয়ঙ্কর কেমন!

এ ঘরে যখন স্বামী-স্ত্রী রাত্রির ভয়ঙ্কর নিয়ে আলাপ, আলোচনা চলছিলো তখন পাশের ঘরে মনিরা ছিলো। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলো সে। হাশেম চৌধুরী যে গত রাতে মাড়োয়ারী বাড়ি পুলিশ ফোর্সসহ রাত্রির ভয়ঙ্কর গ্রেফতারে গিয়েছিলো—জানে মনিরা। সম্পুর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে, তাও জানে সে।

হাশেম চৌধুরী এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। যেমন করে হোক রাত্রির ভয়ঙ্করকে শায়েস্তা না করে ছাড়বেন না। মনিরা একটু আশঙ্কিত হয়। যদিও সে জানে, তার স্বামীই রাত্রির ভয়ঙ্কর—আরও জানে, তাকে গ্রেফতার করা বা শায়েস্তা করা কারো সাধ্য নয় তবু বিচলিত হয় মনিরা অন্তরে অন্তরে।

কখন কোথায় কে রাত্রির ভয়ঙ্কর সম্বন্ধে আলাপ করছে সেদিকে থাকে তার সতর্ক দৃষ্টি।

মনিরা প্রাণ দেবে তবু স্বামীর অমঙ্গল হতে দেবে না— এটাই তার কামনা।

হাশেম চৌধুরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাত্রির ভয়ঙ্কর গ্রেফতারে ঝাপিয়ে পড়লো।

আশঙ্কিত হলো মনিরা।

বনহুর তখন তার লুণ্ঠিত অর্থ আর সোনা-দানা আনন্দোদ্দীপ্ত মনে বিলিয়ে দিয়ে চলেছে। কোথায় কার ঘরে খাবার নেই।

কোথায় কে অসুখে ধুকে মরছে, কোথায় কার ঘরে বয়স্ক মেয়ে অর্থের অভাবে বিয়ে দিতে পারছে না। বনহুর প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অভাব পূরণ করে চলেছে।

সেদিন বনহুর তার অদ্ভুত ড্রেসে সজ্জিত হয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

রাত তখন গভীর।

একটা ছায়ামূর্তি তার অলক্ষ্যে গাড়ির পিছন আসনের নীচে লুকিয়ে পড়েছিলো।

বনহুরের গাড়ি যখন ছুটে চলেছে তখন ছায়ামূর্তি অন্ধকারে নিশ্চুপ বসে ছিলো।

গাড়ি দিল্লীর অদূরে নিকৃষ্ট পল্লী অভিমুখে চলেছে। পথ নির্জন এবং অপরিসর মেঠোপথ। দু' ধারে শাল আর পাইন গাছ।

আরও কত নাম-না-জানা গাছও রয়েছে। এ পথে কোনো লাইট-পোষ্ট নেই, গাড়ির আলোতে পথ দেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো বনহুর।

পিছন আসনের ছায়ামূর্তি বোরখাধারিনী মনিরা। সে আজ-কাল প্রতি রাতেই স্বামীকে ফলো করে থাকে। অত্যন্ত সাবধানে গোপনে লুকিয়ে থাকে সে। বনহুর অতো সতর্ক থাকা সত্তেও মনিরার চাতুরির কাছে পরাজিত হয়েছে।

বনহুরের গাড়ি গিয়ে থামলো একটা পল্লী অঞ্চলে। ঘন বনানী ঢাকা ছোট ছোট ঘরের চালা ঘরগুলো যেন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। দিল্লী নগরীর বাইরে এমন নির্জন পল্লী আছে—ভাবাও কঠিন।

বনহুরের গাড়ি থামতেই কতগুলো হাড়-জিরজিরে নারী-পুরুষ এসে তার গাড়ির চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো।

এতো রাতেও এরা জেগে ছিলো।

বনহুরের গাড়ির হর্ণ শোনামাত্র সবাই বিপুল উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছে। তারা যেন জানতো—আসবে বনহুর।

মনিরা অন্ধকারে আত্মগোপন করে দেখছে স্বামীর কাণ্ডকলাপ।

তার স্বামী যে দস্যু এ কথা সে জানে কিন্তু তার কার্যকলাপ তো কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে দেখে মনিরা।

গাড়ির দু'পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত নারী-পুরুষ। কারো দেহে বস্ত্র আছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না—সামান্য একখণ্ড ন্যাকড়ায় ওরা কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করছে। কারো কারো হস্তে লণ্ঠন ছিলো, লণ্ঠনের আলোতে অস্পষ্ট প্রেত আত্মার মতই লাগছিলো ওদের।

দু' হাত প্রসারিত করে দিয়েছে সবাই গাড়ির দিকে।

বনহুর একটা থলির মধ্য থেকে টাকা-পয়সা আর সোনার টুকরা ওদের হাতে মুঠি মুঠি তুলে দিচ্ছে। সে কি অদ্ভুত অপূর্ব দৃশ্য!

বনহুরের মুখমণ্ডল দীপ্ত- উজ্জল। স্বল্প আলোতে তাকে দেব পুরুষের মত লাগছে। সেকি জ্যোর্তির্ময় চেহারা! স্বামীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে মনিরার দু' চোখে আনন্দ অশ্রু ঝরে পড়ে।

ফিরে আসে বনহুর তার দীন- হীন অসহায় বন্ধুদের কাছ থেকে।

বনহুর গাড়ি রেখে চলে যায় ভিতরে।

মনিরা তখন ফিরে যায় বাংলোয়।

আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। বাংলোর গেটে রাইফেলধারী পুলিশ টুলেন উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

সমস্ত দিল্লী নগরী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

মনিরা নিজ কক্ষের পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

পাশের কামরায় তখন হাশেম চৌধুরী আর মাসুমা গাঢ় নিদ্রায় অচেতন।

❑

সারাটা দিন শহরময় সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায় কেশব আর নূরী। কোনোদিন বা নূরী নাচ দেখায়, কেশব মাদল বাজায় তার সঙ্গে।

নূরী জংলী মেয়ে।

জঙ্গলে তার জন্ম। নূরীর তাই এ-সবে কোনো লজ্জা বা সংকোচ নেই। ঘাগ্ড়া পরা, গায়ে আঁট-সাট ব্লাউজ, একটা ওড়না জড়িয়ে থাকে সে গলায় আর বুকে। মাথার চুলগুলো ওর চিরকালই খাটো আর কোঁকড়ানো। ডাগর ডাগর হরিণ আঁখির মত দু'টিচোখ।

নূরী যখন নাচ দেখায় তখন অগণিত জনতা চারপাশে ভীড় জমিয়ে ফেলে। তারিফ করে নূরীর নাচের; পয়সাও হয়—ওদের দু' জনার খাওয়া-পরা চলে যায় কোনো রকমে।

সারাদিন পর ফিরে যায় তাদের ছোট্ট কুঠিরে।

নূরী রান্না করে, আর কেশব বসে থাকে তার পাশে। বন থেকে শুক্‌নো কাঠ সংগ্রহ করে এনে দেয় সে নূরীকে।

রান্না শেষ হলে দু'জনে বসে খায়।

নূরী শয়ন করে কুঠিরের মধ্যে আর কেশব থাকে কুঠিরের দাওয়ায়।

ওরা যে পল্লীতে বাস করে ওটা সাপুড়েদের আবাসভূমি।

নূরীদের কুঠিরের আশে-পাশে বেশ কয়েকটা কুঠির আছে। আর আছে বেশ কিছু তাঁবু।

সাপুড়েদের দলপতি হীরালাল্ বয়স্ক হলেও অত্যন্ত দুঃসাহসী। তার মনে যেমন সাহস, দেহে তেমনি অসীম বল। সমস্ত সাপুড়ে দল তাকে ভয় করে—সমীহ করে।

হীরালাল ভালোবাসতো কেশব আর নূরীকে। সে-ই আশ্রয় দিয়েছিলো ওদের দু'জনকে। নূরী হীরালালকে বাবা বলে ডাকতো, কেশবও তাই। হীরালালও ওদের পুত্র-কন্যার মতই স্নেহ করতো।

হীরালাল কেশব আর নূরীকে ভালবাসে—এটা সহ্য হতো না হীরালালের ভ্রাতুস্পুত্র রংলালের। সে কিছুতেই কেশবকে বরদাস্ত করতে পারতো না। রংলালের লোভ ছিলো নূরীর উপর। নূরীকে সে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য নানা রকম উপায় খুঁজে ফিরতো।

অনেকদিন কেশবের অজ্ঞাতে সে ওর কাছে প্রেম নিবেদন করেছে, কিন্তু সর্বতোভাবে বিমুখ হয়েছে সে। নূরীকে সে কিছুতেই বশে আনতে সক্ষম হয়নি।

একদিন রাতে নূরী শুয়ে আছে নিজের কুঠিরের মধ্যে। ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

বারান্দায় শুয়েছে কেশব।

সারাটা দিন ওরা সাপ খেলা দেখিয়ে আর নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করেছে: তারপর ক্লান্ত অবশ দেহ নিয়ে অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়েছে ও রা।

হঠাৎ নূরীর ঘুম ভেংগে যায়—অন্ধকারে কে যেন তার মুখ টিপে ধরেছে।

নূরী চীৎকার করতে যায়, কিন্তু একখানা বলিষ্ঠ হাত তার কণ্ঠ রোধ করে দেয়।

ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

বাইরে ঘুম ভেংগে যায় কেশবের। ধড়ফড় উঠে কুঠিরে প্রবেশ করে, ম্যাচ জ্বালে কেশব। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টো তার বিস্ময়ে চক্ চক্ করে উঠে।

কেশবকে দেখেই নূরীকে ছেড়ে দেয় রংলাল।

কিন্তু কেশবের মাথায় রক্ত তখন গরম হয়ে উঠেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে রংলালের উপর। শুরু হয় আবার ধস্তাধস্তি।

নূরী আর্ত চীৎকার করে উঠে—বাবা,বাবা, বাঁচাও, বাঁচাও....

সাপুড়ে সর্দার হীরালালের নিদ্রা ছুটে যায়, সে সুতীক্ষ্ণ ছোরা হস্তে ছুটে আসে নূরীর কুঠিরে। রংলাল আর কেশবকে কুঠিরের মেঝেতে ধস্তাধস্তি করতে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

নূরী তখন এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

হীরালালকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তার বুকে মাথা রাখে —বাবা, রংলাল আমাকে পাকড়াও করেছিলো। কেশব আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে।

হীরালালের চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠে।

কঠিন কণ্ঠে বলে—রংলাল খবরদার!

বাধ্য হয় রংলাল কেশবকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে। হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকে সে।

হীরালাল হাতের সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরাখানা উদ্যত করে বলে—ফের যদি ফুল মাইয়ার গায়ে হাত দিবি তাহলে তোকে খতম করিয়া দিবো। বেরিয়ে যা, আমাদের আস্তানায় আর তোর জায়গা হবি না।

রংলাল রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে তাকালো হীরালাল, কেশব আর নূরীর দিকে, তারপর দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো।

হীরালাল ওর চলে-যাওয়া পথের দিকে খানিকটা থুথু নিক্ষেপ করে বললো—যা চলে যা.......

এবার কেশব আর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো হীরালাল—তোরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে যা। বদমাস আর আসবি না।

হীরালাল তার ছোরাখানা কোমরের ফাঁকে গুঁজে রেখে বেরিয়ে যায়।

নূরীর চোখে ঘুম আর আসে না, তার মনের আকাশে তখন চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়ে। কোথায় তার হুর, এতোবড় শহরের বুকে আর কত তাকে খুঁজে ফিরবে! দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কত জায়গাতেই না নূরী আর কেশব ঘুরে ফিরেছে—সাপ খেলা দেখিয়েছে। নাচ দেখিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করেছে: কিন্তু নজর তার সব সময় অন্বেষণ করে ফিরেছে প্রতিটি লোকের মুখে মুখে, খুঁজেছে তার বনহুরকে।

কত আশা নিয়েই না রোজ বের হয় ওরা, ভাবে আজ নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাবে। যে বেশেই থাক—নূরীর চোখে ধুলো দিতে পারবে না সে। শহরের প্রতিটি রাস্তায় বাড়ি বাড়ি সাপ খেলা দেখিয়েছে। প্রতিটি দোকানে দোকান, হোটেলে হোটেলে, ক্লাবে—সব জায়গায় ফিরেছে; কিন্তু তার দেখা পায়নি। তবে কি বনহুর আবার ফিরে গেছে তার আস্তানায়! নূরী শুয়ে শুয়ে ভাবে এসব । তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

❑

কেশবও ঘুমিয়ে পড়েছে।

রংলাল চলে যায় তাদের আস্তানা ছেড়ে। আর ফিরে আসার সাহস তার হয় না। কিন্তু চলে গেলেও রাগ তার কমে না একটুও।

বরং নূরীকে হস্তগত করার জন্য সে উন্মত্ত হয়ে উঠে। গোপনে সে কৌশল অবলম্বন করে—কেমন করে প্রতিশোধ নেবে হীরালালের উপর, কেমন করে কেশবকে পথ থেকে সরাবে, কেমন করে নূরীকে করবে আত্মসাৎ।

রংলাল ক্ষিপ্তের ন্যায় অস্থির হয়ে পড়েছে। সে বিষাক্ত সর্প জোগাড় করেছে, সে সর্প দিয়ে হত্যা করবে কেশবকে, হত্যা করবে রংলালকে। সুতীক্ষ্ণ ছোরা সংগ্রহ করেছে; বাধা দিতে আসবে যে, তাকে খতম করবে।

সাপুড়ে রংলাল ভীষণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো। আস্তানা থেকে বাইরে যেয়ে সে নানাভাবে বুদ্ধি আটতে লাগলো কিভাবে সে ওদের সর্বনাশ করবে।

কেশব আর নূরী প্রতিদিনের মত সেদিনও সাপ খেলা দেখাতে বের হয়। আজ আবার নূরী ও কেশব যায় পুলিশ সুপারের বাংলোয়।

নূরী আর কেশবকে দেখে খুশীতে আত্মহারা হলো মাসুমা আর মনিরা।

হাশেম চৌধুরীও আনন্দিত হলো ওদের দেখে, হেসে বললো —কিরে, তোরা এতোদিন পর এলি?

কেশব বললো—বাবুজী, আমরা বহুৎ দূরে থাকি। এক একদিন এক একদিকে চলে যাই। এদিকে এলে তবে তো আসবো!

বেশ, এসেছিস যখন সাপ খেলা দেখা।

হাঁ বাবুজী, দেখাচ্ছি। বললো কেশব।

ওরা দু'জনে মিলে সাপ বের করলো।

বাঁশী বাজাতে লাগলো কেশব। নূরী সাপ খেলা করতে লাগলো।

দাঁতভাঙ্গা বিষধর সাপ, তাই নূরী আর কেশব সহজেই ওদের বশে আনতে পারতো।

নূরী বাঁশীর সুরে সুরে মিলিয়ে গান গায়।

মনিরা আর মাসুমা মুগ্ধ হয়ে যায়।

হাশেম চৌধুরীও বিমুগ্ধ হয়। এমন সুমধুর সুর জীবনে বুঝি শোনেনি তারা।

খেলা শেষ হলে হাশেম চৌধুরী দশ টাকার একখানা নোট দেন কেশবের হাতে।

মনিরা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো; সে নিজের কণ্ঠ থেকে খুলে দেয় চেন মালাটা, যে মালার লকেটে আছে তার আর বনহুরের ছোট্ট বেলার ফটো দুটো।

এ মালা মনিরা সব সময় গলায় পরে থাকতো। বিশেষ করে বনহুরের সঙ্গে তার মিলন হবার পর থেকে কোনোদিন এ মালা সে গলা থেকে খোলেনি।

আনন্দের আতিশয্যেই মালাটা মনিরা তুলে দেয় নূরীর হাতে! নূরী খুসী হয়ে গলায় পরে সেটা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনিরা নিজের ভুল বুঝতে পারে। নূরী তখন মালাটা গলায় পরে নিয়েছে, খুসীতে চোখ দুটো তার দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মনিরা মালাটা আর ফিরিয়ে নিতে পারে না।

নূরী আর কেশব খুসী হয়ে চলে যায়।

ঠিক সে সময় বাংলোর গেটে বনহুরের গাড়ি এসে থামলো। কল্পনা ও স্বপনকে নিয়েই এসেছে সে।

মাসুমা বললো—রঞ্জন বাবু এসেছেন।

মনিরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাগানবাড়ি থেকে উঠে গেলো ভিতরে।

মাসুমা আর হাশেম চৌধুরী এগিয়ে গেলো।

বনহুর, স্বপন আর কল্পনা গাড়ি থেকে নেমে বাগানের দিকে অগ্রসর হলো।

হাশেম চৌধুরী বললো—হ্যালো রঞ্জন বাবু।

বনহুর এগিয়ে এসে করমর্দন করলো পুলিশ সুপারের, তারপর হেসে বললো—কেমন আছেন ভাবী?

বনহুর মাসুমাকে ভাবী বলে ডাকতো।

কল্পনা আর স্বপন ডাকতো বৌদি বলে।

বনহুরের কথায় বললো মাসুমা—খুব ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন রঞ্জন বাবু?

আসন গ্রহণ করতে করতে বললো বনহুর—রাত্রির ভয়ঙ্করের ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত।

মাসুমা বললো—তাতো হবেই, যাদের প্রচুর অর্থ-ঐশ্বর্য তাদের আতঙ্কিত হবার কথাই যে। তা যাই বলুন—আজ পিয়ানো শোনাতে হবে। রঞ্জন বাবু, শুধু আপনার হাতে পিয়ানো শুনবো বলেই আমি পিয়ানো কিনেছি।

বনহুরের মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠলো, বললো—আমার মত ভাগ্যবান কে আছে বলুন। পুলিশ সুপার-স্ত্রী আমার পিয়ানোভক্ত।

শুধু আমিই আপনার পিয়ানোভক্ত নই রঞ্জন বাবু। আমার বান্ধবী আলেয়া আপনার পিয়ানোব সুরে আত্মহারা।

মৃদু হেসে বলে বনহুর—তাই নাকি!

হাঁ, শুধু আত্মহারাই নয় রঞ্জন বাবু। একেবারে সম্বিৎহারা......কথাটা বলে হাসেন হাশেম চৌধুরী।

মাসুমা বলে—রঞ্জন বাবু, আপনি আলেয়াকে জানেন না, বড় হাসি-খুসী আর আনন্দ প্রিয়.....

কিন্তু তাকে বড্ড বেরসিক মনে হয়। বললো বনহুর।

কেন?

আজকাল কেউ অমন বোরখা পরে নাকি?

ওঃ, তাই বলছেন বড় বেরসিক? আপনি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না রঞ্জন বাবু। আমার বান্ধবীর মত মেয়েই হয় না, বেচারী বড় অসুখী। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মাসুমা।

বলে উঠে কল্পনা—সত্যি আলেয়াকে দেখলে কেমন মায়া হয়। সব সময় তার মুখমণ্ডল কেমন যেন চিন্তাযুক্ত লাগে।

বললো বনহুর—তাই বুঝি বান্ধবীর প্রতি এতো দরদ আপনার?

মিথ্যা নয় রঞ্জন বাবু, মাসুমা বান্ধবীর নামে পাগল। দেখছেন না কেমন নিজের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। কথাটা বললেন হাশেম চৌধুরী।

মাসুমা ক্রুদ্ধ হবার ভান করে বলে—ছিঃ ও যদি শোনে তাহলে কি মনে করবে বলো তো? আপনি ওর কথা শুনবেন না রঞ্জন বাবু। জানেন, আমার বান্ধবী অনেক বড়ঘরের মেয়ে। কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য তার আছে। শুধু তার মনে শান্তি নেই এবং সে কারণেই আমি ওকে সঙ্গে এনেছি......

বলেই ফেলো না, এতোই যদি বললে। বললেন হাশেম চৌধুরী।

বনহুর বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে, তার মনেও যে এ কথা জানার প্রবল বাসনা।

বলতে শুরু করে মাসুমা—আমার বান্ধবী বিবাহিতা।

কি বললেন, আপনার বান্ধবী বিবাহিতা?

হাঁ, রঞ্জন বাবু।

তার স্বামী....সংসার.....

সে কথাই আপনাকে বলবো। আমার বান্ধবীর স্বামী সেনা বিভাগের সেনাপতি। স্ত্রীর প্রেমের চেয়ে তার কাছে দেশপ্রেম অনেক শ্রেয়। কাজেই সেনাপতি তার দেশ নিয়ে মেতে থাকেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আর আমার বান্ধবী স্বামীর প্রেমে আত্মহারা, সে দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত প্রতীক্ষা করে তার স্বামীর; কিন্তু হতভাগ্য স্বামী কোনোদিন তার স্ত্রীকে স্মরণ করে না।

অবাক হয়ে শুনছিলো বনহুর মাসুমার কথাগুলো। নিশ্চুপ নিস্পন্দ হয়ে শুনে চলেছে সে, কেমন যেন অসাড়ের মত।

মাসুমা বলে যাচ্ছে—অপদার্থ স্বামী বুঝলো না তার সতী লক্ষ্মী স্ত্রীর মর্যাদা। স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা কোনোটাই তাকে ঘরে বন্দী করে রাখতে পারলো না।

বনহুর নিজের মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। মাসুমার কথাগুলো তারই অন্তরে এসে বিদ্ধ হচ্ছিলো যেন।

মাসুমা যখন বনহুরের কাছে সব বলছিলো তখন বাগানের একটা হাস্নাহানার ঝাড়ের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো মনিরা, সে লক্ষ্য করছিলো স্বামীর মুখোভাব। মাসুমাকে মনিরা শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছিলো অন্তরে অন্তরে।

বলে চলেছে মাসুমা—আমার বান্ধবীর মত মেয়েকে যে স্বামী তুচ্ছ জ্ঞানে ভুলে থাকতে পারে, তার মত হতভাগ্য স্বামী আর কে আছে বলুন?

হাঁ সত্যি বলেছেন মিসেস চৌধুরী। হতভাগ্য স্বামীই বটে।

মনিরা উপলব্ধি করে বনহুরের অন্তরের ব্যথা। সে দেখে, ওর চোখ দুটো কেমন সকরুণ হয়ে উঠেছে। সুন্দর ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তার ছাপ। আর কেউ না বুঝলেও মনিরা বুঝতে পারলো ওর মনের কথা।

মাসুমা বলে চলে—তাই বেচারী বড় মনমরা হয়ে থাকে। কোনো সময় তার মনে আনন্দ নেই। স্বামীর বিরহে বিরহিনী.....ব্যথা-ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে।

হঠাৎ বনহুর লক্ষ্য করলো, হাস্নাহানার আঁড়াল থেকে সরে গেলো একটা ছায়ামূর্তি। আনমনা হয়ে পড়লো সে, তাহলে বোরখাধারিনী এতোক্ষণ আঁড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলো। সব যেন কেমন রহস্যপূর্ণ মনে হয়।

❑

মাসুমার অনুরোধে পিয়ানো বাজাতে হয় বনহুরকে।

ড্রইংরুমে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো বনহুর। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় ওদিকের জানালায়। দেখতে পায়—এক জোড়া ব্যাকুল আঁখি স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বনহুরের দৃষ্টি ওদিকে পড়তেই সরে গেলো জোড়া আঁখি দু'টি।

বনহুরের দৃষ্টি ফিরে এলো পিয়ানোর বুকে, কিন্তু হাতখানা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলো তার।

পিয়ানো বাজানো শেষে বনহুর বিদায় নিয়ে যখন গাড়ির দিকে পা বাড়ালো তখন আবার সে লক্ষ্য করলো—দরজার আঁড়াল থেকে কেউ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

গাড়িতে বসে বনহুরের মনে নানারকম চিন্তার উদ্ভব হতে লাগলো! বোরখাধারিনী কে? কি চায় সে তার কাছে? শুধু আজ নয়, আরও অনেক দিন সে লক্ষ্য করেছে—দুটি ব্যাকুল আঁখি তাকে যেন অন্বেষণ করে ফিরছে। বনহুর বুঝতে পেরেছে—ও আঁখি দুটি অন্য কারো নয়—ঐ বোরখাধারিনীর। কিন্তু কেন, কেন সে অমন করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে? মিসেস চৌধুরী বললেন তার বান্ধবী বিবাহিতা......বিবাহিতা নারীর পক্ষে কোনোসময় উচিৎ নয় এসব, তবে কি মিসেস চৌধুরীর বান্ধবী চরিত্রহীনা।

কল্পনা আর স্বপন ধরে বসলো এতো শীঘ্র বাসায় ফিরবে না, বেড়াতে যাবে কোথাও।

অগত্যা বনহুর রাজী হলো কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়। স্বপন বললো যমুনা তীরে আর কল্পনা ধরলো সিনেমায় যাবে। শেষ পর্যন্ত কল্পনার কথাই মেনে নিতে হলো স্বপনকে। বনহুরও রাজী হয়ে গেলো। অনেক দিন ছবি দেখা হয়নি তার, কাজেই বেশি আপত্তি করলো না বনহুর।

দিল্লীর শ্রেষ্ঠ ছবিঘর 'রূপসী মহল'। বনহুরের গাড়ি রূপসী মহলের দিকে অগ্রসর হলো।

আনন্দ ধরে না কল্পনার।

স্বপনও খুসী হয়েছে।

বনহুর স্বয়ং ড্রাইভ্ করছিলো।

হঠৎ বনহুর দেখলো—পথের এক জায়গায় লোকজন ভীড় করে কিছু দেখছে।

বনহুর গাড়িখানার স্পীড কমিয়ে দিলো। শোনা গেলো একটা সুমিষ্ট সুর আর তার সঙ্গে নুপুর ধ্বনি।

কল্পনা আর স্বপন আগ্রহভরা নয়নে দেখার চেষ্টা করলো; কিন্তু এতো ভীড়ের চাপে ওরা কিছু দেখতে পেলো না।

কল্পনার বড় সখ সে দেখবে।

বনহুর বললো—যাও, তাহলে দেখে এসো গিয়ে। স্বপন, তুমিও যাও।

আর আপনি? বললো কল্পনা।

আমি এখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছি, তোমরা দু'জনা যাও, দেখে এসো গে।

কল্পনা আর স্বপন নেমে গেলো গাড়ি থেকে।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে বসে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো স্বপন আর কল্পনা।

কেশব মাদল বাজাচ্ছিলো।

নাচছিলো নূরী।

নূরীর চরণের নুপুর ধ্বনি আর গানের সুর পথের লোকজনদের বিমুগ্ধ করে ফেলেছিলো। সবাই ভীড় জমিয়ে দেখছিলো ওর নাচ।

স্বপন আর কল্পনা ভীড় ঠেলে এসে দাঁড়ালো। ওরাও মুগ্ধ হয়ে গেলো নূরীর নাচ আর গান শুনে।

বনহুর তখন গাড়িতে বসে ধুম্র উদগীরণ করে চলেছে, সে জানে না—তারই নূরীর কণ্ঠ এটা, তার নূরীরই চরণধ্বনি তাকে আনমনা করে তুলেছে। নীরবে বসে বসে শোনে সে।

ওদিকে নূরী নাচে-গায় আর দৃষ্টি তার খুঁজে ফেরে লোকের মুখে মুখে—কোথায় তার হুর।

কেশব মাদল বাজায়।

এক সময় ফিরে আসে স্বপন আর কল্পনা, গাড়িতে চেপে বসে।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়।

কল্পনা বলে—রঞ্জনদা, তুমি যদি দেখতে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতে।

তাই নাকি? ড্রাইভিং আসন থেকে বলে বনহুর।

হাঁ, সত্যি আশ্চর্য। বললো স্বপন।

কি আশ্চর্য? জিজ্ঞাসা করলো বনহুর।

স্বপন বললো—সবই।

তার মানে?

মানে যেমন নাচ, তেমনি গান, তেমনি রূপসী......

হেসে উঠে বনহুর—রূপসীকে মনে ধরলো নাকি?

দ্যুৎ, কি যে বলেন! বললো স্বপন।

কল্পনা বললো—সত্যি রঞ্জনদা, অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর দেখিনি।

ওঃ তুমিও দেখছি নাচনেওয়ালীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছো।

শুধু আমি নই, সত্যি রঞ্জন দা আপনি যদি দেখতেন!

সর্বনাশ, আমি তাহলে না গিয়ে ভালই করেছি, কি বলো?

ঠকেছেন আপনি। বললো কল্পনা।

এ্যাঁ, ঠকেছি তাহলে? যাক, ভাগ্য যদি থাকে তবে আর একদিন বরাৎ হয়ে যেতে পারে। এইতো রূপসী মহল এসে গেছে, চলো।

গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বনহুর, স্বপন আর কল্পনা। টিকেট করে প্রবেশ করলো হলের মধ্যে।

তখন টাইটেল দেখানো হচ্ছে, হল অন্ধকার।

আসন গ্রহণ করলো বনহুর, স্বপন আর কল্পনা। বনহুর অন্ধকারেই লক্ষ্য করলো তার পাশেই বসে আছে একজন নারী এবং সে বোরখা—পরা!

বনহুর লক্ষ্য করলেও স্বপন আর কল্পনা করেনি।

একটা গভীর সন্দেহ বনহুরের মনে দানা বেঁধে উঠলো। তবে কি পুলিশ সুপারের বাড়ির সেই মহিলা গোয়েন্দা এটা? আজ বনহুর একে হাতে-নাতে শায়েস্তা করে তবে ছাড়বে।

ছবি শুরু হলো।

একটা ইংলিস পিকচার দেখানো হচ্ছে। ফাইটিং চিত্র। বনহুরের ছবি দেখা অভ্যাস নেই, ফাইটিং চিত্র দেখে সে তন্ময় হয়ে গেলো।

যখন ছবি শেষ হলো ফিরে তাকিয়ে দেখলো বনহুর, ওদিকের আসন শূন্য-বোরখাধারিনী নেই! কিন্তু নজর পড়লো একটা কাগজের টুকরা পড়ে আছে সে আসনের উপরে।

বনহুর এগিয়ে গেলো, সকলের অলখ্যে কাগজের টুকরাটা তুলে নিলো হাতে। মাত্র এক লাইন লেখা কাগজের টুকরায় ঃ

রাত একটায় আমি আসবো তোমার ঘরে,
দরজা খুলে রেখো।

—বান্ধবী

কাগজের টুকরাটা পকেটে রেখে হাসলো বনহুর। বান্ধবীই বটে—না-হলে তাকেও নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়ছে। আজ আবার কি মতলব নিয়ে আগমন করবে তাই বা কে জানে!

❑

মনিরা সোজা এসে হাজির হলো স্বপনদের বাড়িতে। অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করে ডাকলো—কল্পনা.....কল্পনা........

ব্যস্তভাবে এগিয়ে চলো চাকর-বাকরের দল, বললো তারা—ওরা তো বাসায় নেই।

মনিরা বললো—কখন আসবে তোমরা জানো?

একজন উত্তর দিলো—ঠিক্ করে আমরা বলতে পারছি না, আপনি বসুন, ওরা হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে।

না, আমার বসবার সময় নেই, তবে রঞ্জন বাবুর সঙ্গে জরুরী একটা দরকার ছিলো। তা একটা কাগজ আর কলম দাও তো, লিখে রেখে যাই?

আমরা চাকর-বাকর মানুষ—কাগজ আর কলম কোথায় পাবো। আপনি বরং উনার ঘরে টেবিলে কাগজ-কলম সব আছে, লিখে রেখে যান।

সেই ভাল....মনিরা এটাই চাইছিলো। সে বিলম্ব করলো না, বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে চারদিকে তাকালো। সর্বত্র স্বামীর হস্তের ছোঁয়া যেন ছড়িয়ে আছে। বিছানায় হাত রেখে অনুভব করলো। বালিশটা তুলে গালে-মুখে-কপালে ছোঁয়ালো। তারপর আলনায় ঝুলিয়ে রাখা জামাটা তুলে চেপে ধরলো বুকে—সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলো স্বামীর স্পর্শ। টেবিলে এসে কাগজ আর কলম তুলে নিলো, কিন্তু কিছু লিখলো না সে। কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় শুধু বালিশে ছড়িয়ে দিলো খানিকটা গুড়োর মত পাউডার।

চাকর-বাকরদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো মনিরা।

মনিরা চলে যাবার কিছু পরে ফিরে এলো বনহুর, স্বপন আর কল্পনা।

রাত হয়ে গিয়েছিলো অনেক, কাজেই সেদিন আর কোনো গল্প-সল্পের আসর না জামিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যে যার শোবার ঘরে চলে গেলো।

স্বপন আর কল্পনা চলে গেলে, বনহুর প্রবেশ করলো নিজের কক্ষে। বনহুর আবার পকেট থেকে বের করে পড়লো চিঠির টুকরাটা। হাসলো বনহুর আপন মনে, আজ সে দেখে নেবে—কে ঐ বোরখাধারিনী। বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভান করে থাকবে, তারপর সে যখন এসে দাঁড়াবে তার বিছানার পাশে, তখন আচমকা ওর হাতের রিভলভার কেড়ে নিতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এ নারী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে তার মত দস্যুকেও নাকানি-চুবানি খাওয়াতে পারে কোনো নারী!

হাতঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর, একটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। বনহুর রিভলভারটা বালিশের তলায় রেখে চুপচাপ শুয়ে পড়লো বিছানায়। বালিশে মাথা রেখে পাশ ফিরে শুলো। একটা সুমিষ্ট গন্ধ অনুভব করলো বনহুর।

তারপর ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো।

মনিরা বার বার তাকাচ্ছে দেয়ালঘড়ির দিকে।

মাসুমা বললো—যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমারও কিন্তু খুব ঘুম পাচ্ছে আজ। মনিরাও উঠে নিজের কামরায় চলে গেলো।

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করলো বটে, কিন্তু সে শয্যা গ্রহণ করলো না। সে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

মনিরা যখন ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছিলো তখন মাসুমা জানালার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো আত্মগোপন করে।

আজ মাসুমার মনে সন্দেহ জেগেছিলো। মনিরার মধ্যে সে লক্ষ্য করেছিলো একটা আনমনা ভাব। বার বার যখন সে ঘড়ি দেখছিলো তখন মাসুমা আঁচ করে নিয়েছিলো—নিশ্চয়ই আজ মনিরা কিছু করবে। তাই ঘুমের ভান করে চলে গেলেও সে আসলে গেলো না, লুকিয়ে রইলো অন্ধকারে মনিরার কক্ষের পাশে।

শুধু আজ নয়, বেশ কিছুদিন হলো মাসুমা লক্ষ্য করছে মনিরার মধ্যে একটা পরিবর্তন—বিশেষ করে রঞ্জন বাবু যেদিন প্রথম এসেছিলো সেই দিন হতে মনিরা যেন কেমন হয়ে পড়েছে। সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে, রঞ্জন বাবু এলে সে সম্মুখে আসে না অবশ্য কিন্তু তার চোখেমুখে ফুটে উঠে এক আনন্দ উচ্ছ্বাস। তা ছাড়াও মাসুমা আরও লক্ষ্য করেছে—মনিরা আজকাল বড় উদাস হয়ে পড়েছে।

হাশেম চৌধুরী আজ জরুরী কোনো কাজে অফিসে আটকা পড়ে গেছেন। মাসুমার কোনো অসুবিধা হলো না, সে সর্তকভাবে লুকিয়ে মনিরার কার্যকলাপ দেখতে লাগলো।

মনিরা সজ্জিত হয়ে নিয়ে বোরখা পরে নিলো। তারপর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে। আলগোছে দরজা বন্ধ করে বাগানের দিকে অগ্রসর হলো।

মাসুমাও অনুসরণ করলো তাকে।

আজ সে দেখবে—মনিরা কি করে বা কোথায় যায়।

মনিরা যে-পথে অগ্রসর হলো সে-পথ নির্জন; এদিকে তেমন কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই। মনিরার জমকালো বোরখা মিশে গেলো অন্ধকারে।

মাসুমা গোপনে এগিয়ে চলেছে।

একি, মনিরা সোজা স্বপনদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো!

মাসুমাও সাহস করে তাকে অনুসরণ করলো।

গাছের আড়ালে, কখনও বা দেয়ালের পাশ কেটে, কখনও বা লাইটপোস্টের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চললো মাসুমা।

মাসুমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, একটা দারুণ সন্দেহ তার মনকে অস্থির করে তুলছে। তার প্রিয় বান্ধবী মনিরা চরিত্রহীনা---না না, এ কথা মনেও সে স্থান দিতে পারছে না।

কোথায় চলেছে মনিরা? তবে কি সে রঞ্জন বাবুর বাসায় যাচ্ছে? তাই তো মনে হচ্ছে। মাসুমা যা ভাবছিলো তাই হলো। মনিরা প্রবেশ করলো কল্পনাদের বাড়ির ভিতরে। পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

মাসুমাও চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো। মনিরা অদৃশ্য হতেই মাসুমা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো। একি, কোথাও তো ওকে দেখা যাচ্ছে না! মাসুমা জানে, এদিকের কক্ষটায় থাকে রঞ্জন বাবু।

মাসুমা অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো।

ঠিক রঞ্জন বাবুর ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে মাসুমার, সমস্ত শরীর ঘেমে চুপসে উঠেছে—এও কি সত্য! তার বান্ধবী মনিরা......ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘৃণায় মন তার বিষিয়ে উঠলো। এতোদূর এসেছে যখন—শেষ অবধি না দেখে যাবে না সে। জানালার পাশে সে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেললো কক্ষমধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে মাসুমার দৃষ্টি আরষ্ঠ হয়ে গেলো, পা থেকে মাথা অবধি বিদ্যুৎ চমকে গেলো যেন। স্পষ্ট দেখলো—শয্যায় শায়িত রঞ্জন বাবুর মুখের উপর ঝুকে পড়েছে মনিরা, চুম্বন দিচ্ছে তার ঘুমন্ত মুখে! আশ্চর্য হলো মাসুমা, রঞ্জন বাবু যেমন আছে তেমনি রইলো—একটুও নড়ছে না সে!

আর দাঁড়াতে পারে না মাসুমা, সন্তর্পণে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে। বাসায় ফিরে আসে, কিন্তু ঘুমাতে পারে না আর সে।

সমস্ত রাত কাটে অনিদ্রায়। ঘরময় পায়চারী করে মাসুমা। নিজের চোখকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারে না। মনিরার সঙ্গে রঞ্জন বাবুর এতো গভীরতা—এ যেন তার কল্পনার বাইরে!

মাসুমা কক্ষমধ্যে পায়চারী করলেও দৃষ্টি তার ছিলো মনিরার কক্ষের দরজার দিকে। বেশ কিছু সময় কেটে গেলো, এতোক্ষণও ফিরে এলো না মনিরা।

মাসুমা ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে সে। লজ্জায়-ক্ষোভে মাটিতে যেন মিশে যাচ্ছিলো মাসুমা। মনিরাকে সে কোনোদিন মন্দ মেয়ে বলে ভাবতে পারেনি, তাছাড়া তার চাল-চলন অতি সচ্ছ, সুন্দর ও স্বাভাবিক—কিন্তু একি দেখলো সে আজ! রঞ্জনবাবু সুপুরুষ—যে কোনো নারী তাকে ভালবাসতে পারে, তাই বলে মনিরা বিবাহিতা মেয়ে হয়ে,....না না,. এ হতে পারে না, এ হতে পারে না......

ঠিক সে মুহূর্তে কালো বোরখা-পরা মনিরা লঘু পদক্ষেপে তার ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখতে পেলো মাসুমা।

ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত মাসুমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এগিয়ে এলো তার পিছনে, কঠিন কণ্ঠে বললো—মনিরা!

থমকে দাঁড়ালো মনিরা, পিছনে তাকাবার সাহস হলো না তার।

মাসুমা নিকটে সরে এলো, পূর্বের ন্যায় তীব্র কণ্ঠে বললো—মনিরা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি ভাবতে পারিনি তুই এত জঘন্য......

মনিরা এবার তাকালো মাসুমার দিকে, কিন্তু কোনো কথা সে উচ্চারণ করলো না বা করতে পারলো না। নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

মাসুমা বলে চলেছে—আমি জানতাম মনিরা, তুই সচ্চরিত্রা মেয়ে কিন্তু......

এবার বললো মনিরা—মাসুমা!

এ কারণেই তুই ঢং করে রঞ্জন বাবুর সামনে না বেরিয়ে আড়ালে আড়ালে এতোদূর অগ্রসর হয়েছিস্, তার সঙ্গে গোপনে প্রেম করছিস্........

মাসুমা, সংযতভাবে কথা বল্?

আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

মাসুমা!

হাঁ, আমি সব দেখেছি।

এবার মনিরা সরে এলো, মাসুমার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, কাঁধে হাত রাখলো সে মাসুমার।

মাসুমা ক্ষিপ্রহস্তে মনিরার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললো—অপবিত্র কলুষিত দেহে আমাকে স্পর্শ করিস না মনিরা। আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, এরপর আমাকে......

মাসুমা বোন, শোন, শোন বলছি......

না না, আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না মনিরা। যা হবার হয়েছে। এমন জানলে তোকে আমি সঙ্গে করে কিছুতেই আনতাম না।

মাসুমা!

কালকেই আমি ওকে বলবো তোকে দেশে রেখে আসতে।

মাসুমা!

ভয় নেই, আমি আমার স্বামীর কাছে তোর সম্বন্ধে কোনো কথাই বলবো না।

মাসুমা স্থির হয়ে শোন। আমারও অনেক কথা তোকে বলবার আছে।

আমি সব জানি—আর শোনার মত প্রবৃত্তি আমার নেই।

মাসুমা, আমাকে ভুল বুঝিস না বোন।

ভুল! ছিঃ মনিরা, আমি তোকে অনেক সমীহ করতাম। তোকে আমি শ্রদ্ধা করতাম অন্তর দিয়ে। কিন্তু আজ যা দেখলাম.........

মাসুমা—মাসুমা, ধৈর্য ধর বোন। আমি কোনো অসৎ কাজ করিনি। আমি কোনো অন্যায় করিনি মাসুমা। বিশ্বাস কর আমাকে।

মাসুমা কঠিন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুখমণ্ডল গম্ভীর, স্থির দুটি আঁখি। নিশ্বাস দ্রুত বইছে।

মনিরা মাসুমার কাঁধে আবার হাত রাখলো।

চোখ দুটো তার অশ্রু ছলছল করছে। বললো মনিরা এবার—মাসুমা প্রথমেই তোকে কথাটা বললে আজ হয়তো এমন একটা বিভ্রাট ঘটতো না। মাসুমা, আমাকে তুই অবিশ্বাস করিস না বোন। আমি চরিত্রহীনা ব্যাভিচারিণী নই। রঞ্জন বাবুই আমার স্বামী......

মাসুমা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—রঞ্জন বাবু তোর স্বামী!

হাঁ, মাসুমা। আমি জানতাম ভারতবর্ষে এসে ওর সাক্ষাৎ পাবো।

তবে যে বলেছিলি তোর স্বামী সেনাপতি?

সে কথা মিথ্যা নয় মাসুমা, কিন্তু ও বড় খামখেয়ালী, বড্ড এক-গুঁয়ে। যখন যা খুশী তাই করে বেড়ায়। যা তার মন চায় করে। যেখানে তার মন চায় চলে যায়। ওকে ধরে রাখার সাধ্য কারো নেই।

এ সব কি বলছিস মনিরা?

সব সত্য। এতোটুকু মিথ্যা আমি বলবো না তোর কাছে। যদি খামখেয়ালী না হবে তাহলে সুদূর কান্দাই থেকে এই দিল্লী নগরীতে সে এলো কি করে। আর মুসলমান নাম পাল্‌টে দিব্য হিন্দু নাম ধারণ করে স্বপন ও কল্পনার দাদা সেজে বসেছেই বা কি করে?

আশ্চর্য!

শুধু আশ্চর্য নয় মাসুমা—অদ্ভুত। বড় রহস্যময় মানুষ সে! আমি ওকে প্রথম দিন থেকেই চিনতে পেরেছি। কেউ না চিনলেও আমার চোখে ও গোপন থাকতে পারবে না। আমি ওর স্ত্রী।

মনিরা, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না তোর কথা।

সব শুনলে অবিশ্বাস করতে পারবি না মাসুমা। জানিস, ওর জন্য আমি আজ সর্বহারা—পৃথিবীর হাসি, আনন্দ সব নীরস শুধু ওর জন্য। মাসুমা, তোর জন্যই আজ আমি খুঁজে পেয়েছি ওকে। আবার আমার জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠেছে। আবার আমার মনে ফিরে এসেছে আনন্দের উৎস। মাসুমা, আমি ওকে দেখার পর থেকে কি করে যে নিজেকে শক্ত করে রেখেছি, আমি নিজেই জানি না।

মনিরা, তাই তোর এই বোরখা পরার ছলনা।

হাঁ, আমি এতো সহজে ওকে ধরা দেবো না বলেই ওর কাছ থেকে নিজেকে এভাবে গোপন রেখেছি।

এবার মাসুমার মুখে হাসি ফুটে উঠে। বলে মাসুমা, আমাকে তুই ক্ষমা কর বোন।

দোষ তোর নয় মাসুমা, দোষ আমার। অন্ততঃ তোকে বলাটা আমার উচিৎ ছিলো। কিন্তু তোকেও বলতে পারিনি। কেন পারিনি বলবো?

বল্।

ভেবেছিলাম সবার কাছেই গোপন রাখবো এবং কত দূরে গিয়ে এর শেষ হয় দেখবো। আর দেখবো ওর ভিতরের রহস্য—কি কারণে সে কান্দাই ছেড়ে চলে এসেছে এই সুদূর ভারতবর্ষে।

এবার সব বুঝেছি মনিরা। কিন্তু কই ওর কাছে নিজেকে তো গোপন রাখতে পারলি না?

রেখেছি। এখনও আমি ওকে আমার পরিচয় জানতে তো দেইনি।

তবে যে তুই....

ওঃ আমি গিয়েছিলাম তাই? হাঁ।

মাসুমা....হাসলো মনিরা একটু, তারপর বললো আবার—মাসুমা, ও যে ঘুমিয়ে ছিলো।

কিন্তু মনিরা, আমাকে ক্ষমা কর—আমি সব দেখেছি।

ওঃ তাই? তবে শোন, আমি আজ সন্ধ্যায় মার্কেটে যাবো বলে বাইরে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে?

হাঁ, কি সব আনতে গিয়েছিলি জানি।

সত্যি আমি মার্কেটে যাইনি, গিয়েছিলাম ওর ওখানে। আর যাবার সময় একটা ডাক্তারের দোকান থেকে কয়েকটা টাকা কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে খানিকটা ক্লোরফরম ঔষধ সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। তারপর রঞ্জন বাবুর ঘরে প্রবেশ করে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তার বালিশে। তখন রঞ্জন বাবু বা স্বপন, কল্পনা কেউ ছিলো না বাসায়।

হুঁ, এবার বুঝেছি সব। মাসুমা মনিরার গালে মৃদু টোকা দেয়।

মনিরার মুখ এবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, বললো—মাসুমা, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে তোকে।

একটা কেন, হাজারটা অনুরোধ রাখতে রাজী আছি। বল্ এবার?

তুই জানলি শুধু এ কথা, আর যেন কেউ না জানে। এমনকি হাশেম সাহেবকেও বলবি না কিছু।

না না, বলবো না, বলবো না। সত্যি, মনির সাহেব যে রঞ্জন বাবু সেজে বসে আছেন—একেবারে কল্পনার বাইরে।

সেদিন গোটা রাত দুই বান্ধবী মিলে আর ঘুমাতে পারলো না। হাশেম চৌধুরী জরুরী কাজে সন্ধ্যার পর অফিসে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে আর এলেন না সে রাতে। ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি; আজ আমার বাসায় যাওয়া হবে উঠবে না, তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো।

মাসুমা আর মনিরার রাতভর চললো গল্প আর গল্প। কত কথা মনিরা স্বামীর সম্বন্ধে বলতে লাগলো, শুনতে লাগলো মাসুমা। গল্পের যেন শেষ নেই। সব কথা বললেও মিনরা একটি কথা গোপন করে গেলো, যে কথা কাউকে বলার নয়। তার স্বামী দস্যু বনহুর—এ কথাটা বললো না সে ওকে।

❑

মাসুমার কাছে খুলে বলে মনিরা নিজকে অনেকখানি হালকা বোধ করে। এতোদিন তার বুকের মধ্যে যে একটা জমাট আনন্দ চাপা পড়ে ছিলো, আজ যেন সে আনন্দ-উৎস পথ পেয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসে। খুসীতে উচ্ছল হয়ে উঠে মনিরা।

সকাল বেলা ঘর গোছাচ্ছিলো আর গুন গুন করে গান গাইছিলো মনিরা।

পা টিপে টিপে কক্ষে প্রবেশ করে মাসুমা। পিছন থেকে ওর চোখ দুটো ধরে ফেলে।

মনিরা হেসে বলে—মাসু।

চোখ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মাসুমা, বলে সে—আজ যে বড় আনন্দময় দেখছি।

অধরে অধর মিলায়ে করিয়াছ সুধা পান
তাই বুঝি এতো আনন্দ, এতো মধুময় গান?

মাসুমা সুর করে বললো কথাটা—কেমন তাই না?

যাও তুমি বড্ড দুষ্ট মাসুমা।

দাঁড়াও এবার কেমন দুষ্টামি করি, তখন আমাকে দুষ্ট না বলে বলবে লক্ষ্মী বান্ধবী আমার।

আচ্ছা তখন দেখা যাবে।

শোন মনিরা.....ওর কানে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বললো মাসুমা।

হাসলো মনিরা।

এখানে দুই বান্ধবী মিলে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো, তখন বনহুর কেবলমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ভাবছিলো, কই সে তো এলো না। তবে কি তার কথা মিথ্যা? হয়তো তাকে ধোকা দিয়েছে। হঠাৎ নজর পড়লো তার নিজের বুকে আলপিন আঁটা একটা কাগজের টুকরায়। তাড়াতাড়ি খুলে নিলো কাগজের টুকরাটা সে, মেলে ধরলো চোখের সামনে। নজরে পড়লো লেখাটা ঃ

বন্ধু—

এসে ফিরে গেলাম। কই আমার
জন্য তুমি তো জেগে থাকনি? নিয়ে
গেলাম আমার যা পাওনা।

—বান্ধবী

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো, বার বার পড়লো কাগজের টুকরায় লেখাটা। লজ্জায় বনহুরের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো। একটা মেয়ের কাছে তার এমন পরাজয়—একবার নয়, দুবার নয়—পর পর সে তাকে এভাবে জব্দ করে চলেছে। কে এই বোরখা পরিহিতা? যেমন করে হোক জানতেই হবে কে সে?

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করে ভাবে, কি তার পাওনা যা সে নিয়ে গেছে। আবার ঘরে ফিরে এসে তার জিনিসপত্র সব খুঁজে দেখে, না কিছুতো হারায়নি—সব ঠিক আছে। এমন কি তার সুটকেসের মধ্যে ছিলো প্রচুর টাকা-পয়সা আর সোনা। যেমন ছিলো তেমনি আছে।

আশ্চর্য হলো বনহুর।

চা-নাস্তা পর্ব শেষ করে বেরিয়ে পড়লো তখনই, চললো সে বাংলোর দিকে। আজ সে মিসেস চৌধুরীর কাছে জিজ্ঞাসা করবে—বোরখা পরা মহিলা কে, কি তার পরিচয়?

❑

বাংলোয় এসে হাজির হলো বনহুর।

মাসুমা আর মনিরা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলো।

মাসুমা মনিরার চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বললো—দেখলি তো, যাদুকাঠির স্পর্শে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছেন দেবকুমার।

হাসলো মনিরা।

মাসুমা বেরিয়ে গেলো তাড়াতাড়ি করে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করে বললো মাসুমা—রঞ্জন বাবু যে, হঠাৎ অসময়ে।

রঞ্জন বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর, বললো—বসুন, একটা কথা বলবো বলে অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি।

বিরক্ত নয়, খুশী হয়েছি অনেক। বলুন, তারপর খবর কি?

বসুন বলছি। বললো বনহুর।

মাসুমা বয়কে ডেকে চা-নাস্তা আনতে বললো, তারপর আসন গ্রহণ করলো।

বললো বনহুর—মিসেস্ চৌধুরী, আজ আমাকে একটা কথা আপনি খুলে বলবেন আশা করি?

বলুন বলবো।

আপনার বান্ধবীর পরিচয় আমি জানতে চাই।

আমার বান্ধবীর পরিচয়?

হাঁ। বলুন কে সে? আর কেনই বা সে নিজেকে অমন করে আত্মগোপন করে রাখে?

এ কথা জানার জন্যই কি আপনি......

হাঁ হাঁ—বলুন কে সে? আমি সে কথাই জানতে এসেছি।

সে আমার বান্ধবী—একথা আপনি জানেন। তার নাম যে আলেয়া—একথাও আপনি জানেন। আরও জানেন—আমার বান্ধবী পর্দানশীন মেয়ে।

না। তার আরও কোনো গোপন পরিচয় আছে।

আমার বান্ধবীর এমন কোনো গোপন পরিচয় নেই যা আমি জানি না। আমার বান্ধবী বিবাহিতা, তার স্বামী-পুত্র-সংসার এও আছে—তাও জানি। কিন্তু আপনি আজ হঠাৎ তার সম্বন্ধে এমন ভাবে প্রশ্ন করে বসবেন ভাবতে পারিনি।

বেয়াদবী মাফ করবেন, আমি আপনার বান্ধবীর কতগুলো আচরণে বেশ আশ্চর্য হয়েছি।

হাঁ, তা সত্য, ওর কতগুলো চাল-চলন আশ্চর্য বটে। যেমন, আজকালকার মেয়ে হয়ে সে বোরখা পরে। নিজে ভাল সঙ্গীত-চর্চা করতে পারে অথচ অপরের সঙ্গীত শুনে আত্মহারা হয়ে যায়। তারপর নিজের স্বামী থাকতে অপরজনকে যে ভালবাসতে পারে.....রঞ্জন বাবু, আপনি শুনে অবাক হবেন না যেন। আমার বান্ধবী আপনার পিয়ানোর সুরে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছে।

বনহুরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠে, বিশেষ করে মিসেস চৌধুরীর মুখে এ কথা তার মনে অসহ্য লাগে। গম্ভীর হয়ে বসে থাকে সে।

বলে মাসুমা—আপনি হয়তো ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, কিন্তু আমার বান্ধবীর প্রেম পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা।

ছিঃ আপনি এ সব কি বলছেন মিসেস চৌধুরী?

দেখুন যা সত্য তাই বলছি, আপনার অপরূপ সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে রঞ্জন বাবু।

অধর দংশন করে বনহুর।

মাসুমা যখন এসব কথা বলছিলো, তখন মনিরা আড়ালে লুকিয়ে স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো আর মুখ টিপে হাসছিলো সে।

মাসুমা বললো আবার—যদি ওর সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় করতে চান তবে আমি ওকে ডাকছি।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর—যাক্ কাজ নেই আর চাক্ষুস পরিচয়ে। চলি তাহলে?

মাসুমাও উঠে দাঁড়িয়েছিলো, বললো এবার সে—ওকি, চা না খেয়েই যাবেন?

হাঁ।

আমার বান্ধবীর পরিচয়টা......

থাক, দরকার নেই।

বসুন না আর একটু রঞ্জন বাবু।

এখন নয়।

তবে আবার আসছেন তো?

আসবো। বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

মাসুমা হাসে।

মনিরা এবার এসে দাঁড়ায় মাসুমার পাশে—একি তামাসা শুরু করলি মাসু?

এই তো সবে শুরু। বলে হাসে মাসুমা।

বনহুর চলে গেলো বটে, কিন্তু তার মন সচ্ছ হলো না। সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো সে। যেমন করে হোক দেখবে—কে আছে ঐ বোরখার নীচে।

❑

সন্ধ্যার পর আবার এলো বনহুর, এখন তার মুখমণ্ডল সকালের মত গম্ভীর নয়।

হাশেম চৌধুরী আজ সন্ধ্যায় বাসায় আছেন। তিনি রঞ্জন বাবুকে পেয়ে খুশী হলেন অনেক।

মাসুমাও আনন্দিত হলো।

ভিতরে গিয়ে মনিরার কানে মুখ নিয়ে বললো সে—মনিরা, ঔষধ ধরেছে।

মনিরা হাসলো শুধু।

সন্ধ্যায় চায়ের আসর জমলো ভাল।

হাশেম চৌধুরী বললেন—চলুন না আজ লেকের পানিতে নৌকা-ভ্রমণ করে আসা যাক।

খুসী হলো মাসুমা—সত্যি কত দিন নৌকা ভ্রমণে যাওয়া হয়নি। আলেয়াও যাবে আমাদের সঙ্গে।

বনহুর অমত করতে পারলো না।

সবাই মিলে চললো ওর লেকের ধারে।

আজ বনহুর একটা কৌশল অবলম্বন করলো। সে দেখবে, কে ঐ বোরখাধারিনী। বনহুর নিজে একটা বৈঠা নিয়ে নৌকায় মাঝি হয়ে বসলো।

মনিরা বুঝতে পারলো স্বামীর মনোভাব। সে বললো—আমার শরীর বড্ড অসুস্থ লাগছে, নৌকায় যাবো না।

মনিরাকে কিছুতেই রাজী করানো গেলো না। শেষ পর্যন্ত মনিরাকে ছেড়েই ওরা নৌকা বিহারে গমন করলো।

ব্যর্থ হলো বনহুরের মনোভাব। সে ভেবেছিলো, আজ নৌকাডুবি করবে এবং উদ্ধারের ছলনায় বোরখাধারিনীর বোরখা উন্মোচন করে ফেলবে।

মনিরা তীরেই বসে রইলো, আর রইলো কয়েকজন মহিলা। অবশ্য মহিলাগণ সন্ধ্যা ভ্রমণেই এসেছিলো লেকের ধারে। মনিরা অল্পক্ষণে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলো।

গল্পসল্প করে কেটে গেলো কিছু সময়। ফিরে এলো ওরা।

বনহুরের মুখোভাব খুব সচ্ছ নয়, সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো সে।

মনিরা মাসুমার কানে মুখ নিয়ে কিছু বলে হাসলো। তারপর সবাই মিলে ফিরে চললো বাসার দিকে।

❑

বনহুর গাড়ি রেখে নামতে যাবে এমন সময় গাড়ির আসনে একটা চিঠি পেলো সে। বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই বোরখাধারিনীর কাজ। কাগজের টুকরাটা উঁচু করে ধরলো চোখের সামনে। ওতে লিখা আছে দেখলো বনহুর—

বন্ধু,
সব আশা ব্যর্থ হলো, কেমন তাই নয়
কি? নৌকাডুবি থেকে নিজেকে বাঁচাতে
পেরেছি বলে নিজেকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি
—বান্ধবী

বনহুর সোজা চলে গেলো নিজের ঘরে, রাগে-ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো। এতো বড় ধূর্ত মেয়ে বোরখাধারিনী! তার মনের কথা জানলো কি

করে! আবার তার ঢং দেখো, আমাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। সব শয়তানি, সব চালাকি।

বনহুর ওকে কি করে হাতের মুঠায় পাবে সে চিন্তা করতে লাগলো। যেমন করে হোক, বোরখাধারিনীকে একবার কৌশলে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। তারপর কেমন করে তার খোলস খুলে ফেলতে হয় দেখে নেবে।

পরদিন মনিরা বাইরে যাবে বলে তৈরি হয়ে নিলো। মাসুমা আজ যাবে না, হাশেম চৌধুরীর শরীর অসুস্থ থাকায় সে আজ বাসায় রয়েছে।

মনিরা বোরখা পরেই গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভিং আসনে উপবিষ্ট একজন পুলিশ ড্রাইভার। বললো মনিরা—চলো ফজলে এলাহির দোকানে।

বহুৎ আচ্ছা।

চমকে উঠলো মনিরা, এ কণ্ঠ যে তার চির পরিচিত। বললো মনিরা—একটু দেরী করো, আমার ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

মনিরা গাড়ি থেকে নেমে গেলো।

মাসুমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো—ব্যাপার কি? ফিরে এলে যে?

হেসে বললো মনিরা—বন্ধু ড্রাইভার সেজে এসেছে, কাজেই রিভলভারটা দাও, হঠাৎ যদি আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ভ্যানিটি মধ্যে রিভলভার নিয়ে ফিরে আসে মনিরা। গাড়ির পিছন আসনে না বসে এবার বসলো ডে ড্রাইভিং আসনের পাশে।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

ড্রাইভার বেরিয়ে এলো বাংলোর গেট পেরিয়ে।

দিল্লীর রাজপথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। মনিরা লক্ষ্য করলো—গাড়ি সোজা পথে না গিয়ে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দক্ষিণহস্তে রিভলভার চেপে ধরলো ড্রাইভারবেশী বনহুরের পাঁজরে—খবরদার, একচুল বদমাইসি করলে মরবে।

বনহুর কল্পনাও করতে পারেনি, ছদ্মবেশ বুঝতে পারবে বোরখাধারিনী। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ফেললো, বললো—গাড়ি তো নেহি চলেগা বিবি সাব।

কোনোরকম চালাকি কোরো না, আমি জানি তুমি এমনিভাবে আমাকে বিপদে ফেলবে, তাই আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

গাড়ি নেহি চলেগা তব হাম কিয়া করেগা বিবি সাব?

তাহলে গাড়ি থেকে নেমে যাও।

বনহুর উঠতে যাচ্ছিলো।

মনিরা বললো—থামো।

বনহুর চুপ করে বসলো।

মনিরা দক্ষিণহস্তে রিভলভার বনহুরের পাঁজরে চেপে বামহস্তে তার পকেট হাতড়ে ওর ছোট্ট পিস্তলটা বের করে নিলো। তারপর বললো—গাড়ি চালাও।

গাড়ি নেহি চলেগা।

তবে কি মরতে চাও?

এবার বনহুর হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ কে তুমি নারী? তোমার কাছে দস্যু বনহুর আজ পরাজিত....বলো, বলো কে তুমি?

মনিরা বললো—আমার পরিচয় জানতে তুমি পারবে না।

ভালবাসার বিনিময়েও তুমি......

না।

আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো।

হাঁ বাসি, তাই বলে পরিচয় দিতে রাজী নই।

তুমি বান্ধবী, বন্ধুর কাছে আত্মগোপন করে লাভ?

বন্ধু, আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার কুৎসিত মুখ তোমাকে দেখাতে পারবো না। তুমি আমাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

তাই তুমি আমার কাছে আত্মগোপন করে থাকো?

হাঁ। আমি একজন অসহায় নারী। আমার জীবন অত্যন্ত বিষাদময়।

সব শুনেছি তোমার বান্ধবী মিসেস চৌধুরীর কাছে। সত্যই কি তোমার স্বামী.....

হাঁ, যা শুনেছো সব সত্য।

বলো আমার পরিচয় তুমি জানলে কি করে?

সে কথা আজ নয়, বলবো একদিন। বন্ধু, বলো তুমি আমার মুখ কোনোদিন দেখতে চাইবে না?

তা হলে তুমি সুখী হবে?

হাঁ, আমি সুখী হবো। আর শপথ করছি, কাউকে কোনো দিন বলবো না তোমার পরিচয়।

বেশ, চাই না আমি তোমার মুখ দেখতে।

বাঁচালে বন্ধু।

রিভলভার সরিয়ে নাও।

তুমি যদি জোরপূর্বক আমার বোরখা উন্মোচন করো?

দস্যু বনহুর যা বলে তার অন্যথা করে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

মনিরা বনহুরের বুকের কাছ থেকে রিভলভার সরিয়ে নেয়। সে জানে, তার স্বামী যা বলে তা মিথ্যা নয়।

বনহুর বললো এবার—আলেয়া।

বলো?

আমাকে তুমি চেনো অথচ তুমি পুলিশ সুপারের আত্মীয়া হয়েও আমার পরিচয় তাকে জানাওনি কেন?

তোমাকে আমি ভালবাসি বলে।

আমাকে তুমি ভালবাসো? কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি আলেয়া?

লাভ তোমার ভালবাসা পাবো বলে।

আলেয়া, তুমি বিবাহিতা। জানো না অপর পুরুষকে ভালবাসা তোমার পাপ?

যে নারীকে তার স্বামী অবহেলা করে, যাকে ত্যাগ করে স্বামী ভুলে থাকে সুদূর কোনো দেশে—কি করে সে স্বামীর ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরে একটা নারী জীবন কাটাতে পারে বলো?

আলেয়া!

তুমি জানো না, দিনের পর দিন আমি তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছি। কত রাত আমার কেটেছে অনিদ্রায়। কত রাত আমি তার পথ চেয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করেছি। তবু সে ফিরে আসেনি—নিষ্ঠুর পাষাণ সে।

দেশপ্রেমিক স্বামীর স্ত্রী তুমি, তাই তোমাকে এটুকু সহ্য করে নিতে হবে। তোমার স্বামী যে একজন মহান ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলেয়া, তুমি সৌভাগ্যবতী নারী।

না না, আমি অমন সৌভাগ্য চাই না। বন্ধু, আমাকে তুমি মিথ্যা সান্ত্বনা দিও না। আমার মন আছে, প্রাণ আছে। স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর করি—এ সাধ আমারও আছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মনিরা।

এ কাঁদা তার অভিনয় নয়, স্বামীর সান্নিধ্য তার অন্তরকে বিচলিত করে তোলে। মনিরা যা বলে চলে সেকথা তার হৃদয়ের কথা। মিথ্যা সে বলেনি, সত্যই তার কথাই সে ব্যক্ত করে চলেছে।

বনহুর সত্যই সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে, বলে সে—আলেয়া, নারীর স্বামীই যে সবকিছু। স্বামীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়াই নারীর ধর্ম।

উঃ কি নিষ্ঠুর তুমি!

হাঁ, একথা সত্য। আলেয়া, আমিও কম অপরাধী নই। আমার জীবনটাও অত্যন্ত বেদনাভরা। আলেয়া, তুমি আমাকে অভিসম্পাত করো।

আমি চাই না তোমাকে অভিসম্পাত করতে। বলো তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে কিনা?

আমার জীবন সম্বন্ধে তুমি সব জানো না আলেয়া, তাই আমার মত একটা জঘন্য দস্যুর ভালবাসার জন্য তুমি লালায়িত হচ্ছো। তোমার স্বামীর চেয়েও আমি বেশি দোষী—বেশি অপরাধী।

হোক, আমি কিছু জানতে চাই না। আমি চাই তোমার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

আলেয়া, নিজেকে সংযত করো।

না, আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে যাবো।
চলো তোমাকে বাংলোয় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।
আমি বাংলোয় যাবো না।
যাবে না?
না।
কোথায় যাবে?
তোমার সঙ্গে।
হেসে উঠলো বনহুর—আমার সঙ্গে? কিন্তু জানো আমার সঙ্গে গেলে তুমি নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না?
তবু তুমি আমাকে গ্রহণ করবে তো?
আলেয়া—না না, তা হয় না।
কেন হয় না, আমি কুৎসিত কদাকার বলে?
না, আমি দস্যু কিন্তু শয়তান, পাপাচার নই। আলেয়া, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।
বনহুর এবার ড্রাইভিং আসনে সোজা হয়ে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।
আলেয়া নিশ্চুপ বসে রইলো মূর্তির মত।
মনিরা বাংলোয় ফিরে এলো।
মাসুমা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো, মনিরাকে নিয়ে প্রবেশ করলো তার কক্ষে। বললো মাসুমা—কি ঘটলো বোন্ এবার?
মনিরা সব খুলে বললো।
মাসুমা আনন্দভরা কণ্ঠে বললো—তোর স্বামীকে আমি শ্রদ্ধা জানাই মনিরা। নির্জন পথে একটা নারীর প্রেমকে যে পুরুষ উপেক্ষা করতে পারে সে সত্যি কত বড় হৃদয়বান—কত বড় মহৎ-চরিত্র।

❑

বনহুর বাসায় ফিরে গভীরভাবে চিন্তা করে, আজ নতুন করে মনে পড়ে তার মনিরার কথা। সত্যি কতদিন তার সংবাদ জানে না সে। সেও তো নারী, তারও তো মন আছে, প্রাণ আছে—স্বামী, সংসার নিয়ে ঘর করার বাসনা আছে। ছিঃ ছিঃ কি ভুলই না সে করেছে। একটা নিষ্পাপ ফুলের মত জীবনকে সে এভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছে। আজ মনিরার জন্য কোথাও বিয়ে হলে সে কত সুখী হতো! আর আজ তার মনে অহরহ দুর্বিসহ জ্বালা বহন করে চলেছে। আবার কতদিন পর ফিরে যেতে পারবে সে কান্দাই শহরে, তবেই না তার দেখা হবে মনিরার সঙ্গে।
তবে কি মনিরাও আলেয়ার মত অপর কোনো পুরুষের কাছে প্রেমভিখারিনী! না, না, মনিরা সে রকম মেয়ে নয়, সে ধর্মশীলা নারী। তার

মধ্যে পাপ বাসনা কোনোদিন উদয় হতে পারে না। মা আছেন, নূর আছেন, সরকার সাহেব আছেন.......

বনহুর শয্যায় গা এলিয়ে দেয়।

রাত বেড়ে আসে।

আজ বনহুরের চোখে ঘুম নেই—আলেয়ার সান্নিধ্য তাকে মনিরার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বার বার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে ঐ মুখখানা। কতদিন মনিরাকে দেখেনি সে।

বনহুর পায়চারী করছে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে সে।

রাত গভীর হয়ে আসে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পায় বনহুর। থমকে দাঁড়ায়, কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না সে।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—আলেয়া তুমি!

হাঁ, পারলাম না থাকতে।

এতো রাতে এলে কেন?

বন্ধু, আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

আলেয়া, তুমি আমার মনে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছো। তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম—যাও, যাও আলেয়া, ফিরে যাও তুমি।

বন্ধু, তুমি এত হৃদয়হীন!

আমি তার চেয়েও কঠিন।

কিন্তু একদিন আমার কাছে তুমি ধরা দিতে বাধ্য হবে।

আমি শুনতে চাই না তোমার কোনো কথা। যাও তুমি। তোমার মত মনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়েকে আমি ঘৃণা করি।

বনহুরের কঠিন কথাগুলো মনিরার হৃদয়ে যেন সুধা বর্ষণ করলো। তার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলো আজ মনিরা। অনাবিল এক আনন্দ নিয়ে ফিরে এলো সে বাংলোয়।

❑

কয়েকদিন বেশ কেটে গেলো।

একদিন সন্ধ্যায় মনিরা নিজের কামরা থেকে শুনতে পেলো মাসুমার কণ্ঠস্বর—রিভলভারে গুলী ভরে কোথায় যাচ্ছো শুনি?

চাপা স্বরে বললেন হাশেম চৌধুরী—চৌকানিপুরে যাবো। সেখানে এক বাড়িতে আজ রাত্রির ভয়ঙ্কর হানা দেবে বলে জানা গেছে।

কি বললে—রাত্রির ভয়ঙ্কর হানা দেবে? মাসুমার গলার আওয়াজ কম্পিত মনে হলো!

হাশেম চৌধুরী বললেন—এটা আমাদের চক্রান্ত, বুঝলে? চৌকানিপুরের ব্যবসায়ী হরিনাথ আজ এক কোটি টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে কিছু হীরা-মনি-মুক্তা ক্রয় করেছে। এই হীরা-মনি-মুক্তা ক্রয়-সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে দিল্লীর নগরীতে। কাজেই রাত্রির ভয়ঙ্করের কানেও এ সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। নিশ্চয় সে ঐ মনি-মুক্তা সংগ্রহে সেখানে গমন করবে।

সর্বনাশ, পারবে তাকে গ্রেফতার করতে? শুনেছি সেই রাত্রির ভয়ঙ্কর নাকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!

তার চেয়েও আমরা ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। বাড়ির চারদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বিদ্যুৎ নেই। নিশ্চয়ই আজ রাত্রির ভয়ঙ্করের শেষ রাত্রি। আজ সে তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। সে টেরও পাবে না আমাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা।

তাহলে রিভলভার কি হবে শুনি?

কোনো সময় অস্ত্র ছাড়া পথ চলতে নেই। এটা রেখে দিলাম হঠাৎ যদি কোনো প্রয়োজন বোধ করি তখন কাজে লাগবে।

মনিরার মুখ কালো হয়ে উঠলো। স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় মন তার অস্থির হয়ে পড়লো। কেমন করে আজ ওকে আটকানো যায়। সত্যি যদি চৌকানিপুরে যায় সে, তাহলে তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাতে কোনো ভুল নেই। যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে তাকে।

হাশেম চৌধুরী পোশাক পরে পুলিশ ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মনিরা অমনি মাসুমার কক্ষে এসে হাজির হলো—হা রে, চৌধুরী সাহেব কোথায় গেলেন?

ও নাম করতে আমার ভয় হয়। রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতার করতে গেলো। কিন্তু কি যে হবে, আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

সত্যি, আমারও কিন্তু বড্ড ভয় হচ্ছে মাসুমা। হঠাৎ যদি সে আমাদের বাংলোয় হানা দিয়ে বসে! মানে উল্টা কাজ করে?

তাই তো, রাত্রির ভয়ঙ্করের অসাধ্য কিছু নেই।

এক কাজ করবি মাসুমা?

কি কাজ?

ওকে যদি ধরে এনে আজ রাতটা এখানে রাখা যেতো।

ঠিক বলেছিস্ মনিরা। এখন আমাদের আপন জন বলতে ঐ রঞ্জন বাবু ছাড়া আর কে আছে বল্। হাঁ, ওকেই আনতে হবে। বাংলো পাহারা দেওয়াও হবে, পিয়ানো শোনাও হবে। সত্যি, ঠিক বুদ্ধি বের করেছিস্ মনিরা।

তাহলে চল্ যাওয়া যাক্।

হাঁ চল্।

মনিরা আর মাসুমা স্বপনদের বাড়ি এসে হাজির হলো। কল্পনা তো ওদের দু'জনাকে দেখে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। স্বপন ছুটে গেলো রঞ্জন বাবুর ঘরে—রঞ্জনদা, দেখবে এসো কারা এসেছেন!

বনহুর এলো, দেখলো মিসেস চৌধুরী আর বোরখাধারিনী এসে তাদের হলঘরে দাঁড়িয়েছে।

বললো মাসুমা—রঞ্জন বাবু, বিশেষ প্রয়োজনে এলাম আপনার কাছে।

আমার কাছে?

হাঁ, শুধু আপনার কাছে।

কেন বলুন তো?

আজ আমাদের বাংলোয় আপনাকে যেতে হবে।

অসম্ভব।

কেন?

আমার একান্ত প্রয়োজন আছে, একটু পরে বাইরে যেতে হবে।

এবার বোরখাধারিনী বলে উঠলো—আমাদের চরম বিপদ, না গেলেই নয়।

কিন্তু আমার পক্ষে আজ সম্ভব হবে না।

আর যদি সে-পথ বন্ধ হয়ে যায়?

বনহুর ক্রুদ্ধভাবে তাকালো বোরখাধারিনীর দিকে।

বোরখাধারিনী বললো—আমি বললাম আজ আমাদের বাংলোয় তোমাকে যেতে হবে। এসো, এক্ষুণি এসো আমার সঙ্গে।

স্বপন আর কল্পনা আশ্চর্য হয়ে গেছে।

মাসুমা কিন্তু মুখ টিপে হাসছে।

বনহুর বললো—আচ্ছা আপনারা যান, আমি যাবো।

তা হবে না, আমাদের সঙ্গে এসো। এসো বলছি.......

চলুন.....বনহুর অন্য সময় হলে বোরখাধারিনীকে তুমি বলে সম্বোধন করতো, কিন্তু এ মুহূর্তে সে তাকে আপনি বলে।

বনহুরসহ ফিরে এলো মাসুমা আর মনিরা বাংলোয়।

মাসুমা বললো—আমাদের বিপদকালে আপনি আমাদের সহায়। উনি নেই, আপনিই আমাদের ভরসা।

ভয় কি, পুলিশ ফোর্স আছে।

আপনার পিয়ানো শুনে রাত কাটিয়ে দেবো রঞ্জন বাবু।

উঁহু, আজ পিয়ানো বাজবে না আমার হাতে।

কেন?

মনের অবস্থা ভাল নেই।

তাহলে আমার বান্ধবীর বীণার সুর শুনুন। কি রে আলেয়া, রাজী আছিস্ তো?

উনি যখন পিয়ানো শোনাবেন না তখন আমি বীণা বাজাতে রাজী আছি। কিন্তু এক শর্তে আমি বীণা বাজাবো।

বল্ কি সে শর্ত?

আমি যতক্ষণ বীণা বাজাবো ততক্ষণ তোরা শুনবি। কারো ঘুমানো চলবে না কিন্তু।

মাসুমা বললো—বেশ আমি রাজী। কি বলেন রঞ্জন বাবু, আপনি?

আমার শরীর আজ ভাল নয়, কাজেই.....

ও, আপনি তাহলে ঘুমাবেন এই তো? বেশ যতক্ষণ পারেন জেগে থাকবেন.....নাও শুরু করো আলেয়া।

আলেয়া বোরখার মধ্য হতে তার সুন্দর সুকোমল হাত দু'খানা বের করে বীণাটা তুলে নিলো কোলের উপর।

ইতিমধ্যে বীণা এসে গিয়েছিলো মাসুমার নির্দেশে। আর এসেছিলো চা-নাস্তা।

পরিবেশন করলো মাসুম।

মনিরার হাতে বীণার ঝঙ্কার উঠলো।

বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে গেলো বনহুর, সুর তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

চা পান করছে বনহুর। রাত বেড়ে আসছে।

মনিরার হাতে বীণা আর থামতে চায় না।

বনহুব বিমুগ্ধ হয়ে গেছে।

মাসুমার দু'চোখ মুদে আসছে নিদ্রায়।

মনিরার হাত অবশ হয়ে আসে, তবু সে বীণা বাজিয়ে চলে। বীণা থেমে গেলে ওকে আর আটকে রাখতে পারবে না মনিরা। হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়বে, সেই ফাঁকে পালিয়ে যাবে ও। না না, তা হবে না, বীণা তাকে বাজাতেই হবে।

মাসুমা সোফায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনিরা আসনে বসে বীণা বাজিয়ে চলেছে।

পাশের সোফায় বনহুর স্বয়ং বসে, তার দু'চোখে এক উন্মাদনা।

বীণার সুর তাকে আত্মহারা করে ফেলেছে যেন। আকাশ-বাতাস সব যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে সে সুরে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো আসন ত্যাগ করে। তাকালো নিদ্রিত মাসুমার মুখের দিকে। এগিয়ে গেলো মনিরার পাশে। বসলো ঘনিষ্ঠ হয়ে, হাত রাখলো মনিরার হাতের উপর—বন্ধ করো আলেয়া তোমার বীণার সুর। আমাকে মুক্তি দাও......

মনিরার হাতে বীণা থেমে যায়।

বলে মনিরা—আজ তুমি মুক্তি পাবে না।

আলেয়া, আমাকে যেতেই হবে। রাত্রির ভয়ঙ্কর আসবে না। কোনো ভয় নেই তোমাদের।

ভয় আমরা করি না।

তবে কেন আমাকে এভাবে আটকে রাখলে?

আজ নয়, বলবো আর একদিন।
আমাকে যেতে দাও আলেয়া?
না।
সব নষ্ট করে দিলে?
আমি সব জানি, তোমাকে আজ ছেড়ে দিতে পারবো না। প্রাণ গেলেও না।
মনিরা আবার বীণায় ঝঙ্কার তুললো।
বনহুর ফিরে এসে বসলো তার আসনে। সিগারেট ধরালো।
মনিরা বীণা রেখে উঠে দাঁড়ালো।
মাসুমা আর জেগে থাকতে না পারায় চলে গিয়েছিলো নিজের ঘরে। শুয়ে পড়েছিলো বিছানায়, গোটা রাত জেগে থাকা তার পক্ষে অসহ্য।
বনহুর কখন যে সোফায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।
মনিরা বীণা রেখে উঠে গিয়ে চাদরটা এনে বনহুরের শরীরে চাপা দিলো। মাথার নীচে একটি নরম বালিশ যত্ন সহকারে গুজে দিলো। তারপর বনহুরের মাথার চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে চললো।
হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের।
ঘুম ভাঙলেও সে ঘুমের ভান করেই শুয়ে রইলো। চোখ মেললো না সে।
মনিরা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে। কোমল মধুময় সে স্পর্শ।
বনহুরের শিরায় শিরায় একটা অনুভূতি আলোড়ন জাগালো। নিজেকে সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না যেন; তবু নিশ্চুপ রইলো, দেখবে কি করে আলেয়া। বনহুর নিজের ললাটে একটি উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করে। দুটি ওষ্ঠ স্পর্শ করে তার কপাল। ধৈর্যচ্যুত হয় না তবু সে।
ঠিক সে মুহূর্তে কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসে মোয়াজ্জেমের কণ্ঠ সুমধুর আযানধ্বনি।
ভোর হয়ে গেছে।
একি, আলেয়া তার পায়ে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করছে! আশ্চর্য হলো বনহুর। এবার বনহুর সোজা হয়ে বসলো, অবাক কণ্ঠে বললো—আলেয়া তুমি!
সঙ্গে সঙ্গে বোরখাধারিনী মনিরা ছুটে চলে গেলো।
স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুর। মনের মধ্যে নানারকম চিন্তা হতে লাগলো তার। আশ্চর্য মেয়ে আলেয়া, এমন মেয়ে তো সে কোনোদিন দেখেনি। তাকে ভালবাসে বলে অথচ ধরা দেওয়া বা নিজেকে কোনোসময় মুক্ত করে না তার সামনে।
বনহুর সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে।
বাথরুমে প্রবেশ করে সে।
তারপর যখন বাথরুম থেকে ফিরে আসে তখন সে দেখতে পায় তার সোফায় একটা চিঠি পড়ে আছে। ভাঁজ করা একখানা কাগজ।

বনহুর কাগজখানা উঠিয়ে নেয় হাতে; ওটাতে লিখা আছে কয়েক লাইন—

বন্ধু,
তোমাকে ধরে রেখেছিলাম কেন নিশ্চয়ই বুঝতে
পেরেছো? আজ রাতে তোমার চৌকানিপুরে
যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেখানে গেলে তুমি
আর ফিরে আসতে না জানি। ওখানে তোমাকে
হত্যার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিলো।
তড়িতাহত হতে তোমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম
হয়েছি বলে খোদার কাছে আমি হাজার
শুকরিয়া করছি।
তোমার
—বান্ধবী

বনহুর চিঠিখানা হাতে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগলো একটা মৃত্যু-বিভীষিকা রাত।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেলো।

হলঘরে প্রবেশ করলেন হাশেম চৌধুরী। বনহুরকে দেখে খুসীতে আনন্দধ্বনি করে উঠলো—হ্যালো রঞ্জন বাবু, গুড্ মর্নিং।

গুড্ মর্নিং মিঃ চৌধুরী।

হাশেম চৌধুরী রিভলভারসহ বেল্ট খুলতে খুলতে বললেন—ওরা বুঝি আজ রাতে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলো?

হাঁ, দেখতেই পাচ্ছো। উনি না হলে উদ্ধার ছিলো আমাদের? কথাটা বলতে বলতে হলঘরে প্রবেশ করে মাসুমা। একটু থেমে বলে—কি হলো, পাকড়াও করেছো তোমার সেই রাত্রির ভয়ঙ্কর দস্যুটাকে?

হাশেম চৌধুরী বেল্টসহ রিভলভারখানা টেবিলে রেখে একটা সোফায় বসে পড়লেন, হাই তুলে বললেন—সব ব্যর্থ হয়েছে। এতো পরিশ্রম সব পণ্ড হয়ে গেছে।

বনহুর আলগোছে চিঠিখানা পকেটে রেখে বসে পড়লো। বললো সে—কেন সব পণ্ড হলো মিঃ চৌধুরী?

আর বলবেন না, রাত্রির ভয়ঙ্করকে গ্রেফতারের জন্য আজ প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে চৌকানিপুরে একটা বাড়িতে কৌশলে ফাঁদ পেতেছিলাম। প্রায় বিশ হাজার টাকা খরচ করে সমস্ত বাড়িটার ইলেকট্রিক কারেন্ট দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

বনহুর অবাক হয়ে শুনছে, সত্যি তো এতোটা জানতো না। সে শুধু এটুকুই জানতো, চৌকানিপুরের ব্যবসায়ী হরিনাথ প্রায় কোটি টাকার মনি-মুক্তা ক্রয় করে এনেছে। তাই বনহুর প্রস্তুতি নিয়েছিলো ঐ মনি-মুক্তাগুলো

হরিনাথের কবল থেকে উদ্ধার করে ছড়িয়ে দেবে যমুনার জলে, নয়তো দিল্লীর পথে পথে।

এ তো জানতো না সে—নিশ্চয়ই আজ সেখানে গেলে মৃত্যু তার সুনিশ্চয় ছিলো। বনহুর বোরখাধারিনীকে অন্তরে অন্তরে ধন্যবাদ জানায়।

তারপর চলে চা-নাস্তা পর্ব।

খেতে খেতে নানারকম গল্পসল্প বলে। হাশেম চৌধুরীর কথা শুনে হাসে বনহুর। রাত্রির ভয়ঙ্করই যে স্বয়ং দস্যু বনহুর!

এক সময় বনহুর বিদায় নিয়ে চলে এলো।

কিন্তু গত রাতের ঘটনা তার মনের আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। বার বার দুটি উষ্ণ ওষ্ঠের কোমল স্পর্শ অনুভব করতে লাগলো নিজের ললাটে। সব সময় মনে পড়তে লাগলো—বোরখাধারিনী তার পায়ে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করছিলো কেন।

সমস্ত দিন বনহুর একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারলো না বোরখাধারিনীকে।

স্বপন আর কল্পনা এ কথা সে-কথা নিয়ে তাকে কত কি প্রশ্ন করতে লাগলো কিন্তু আজ বড় গম্ভীর উদাসীন মনে হলো রঞ্জন দাদাকে!

বিকেলে বনহুর একাই গাড়ি নিয়ে বের হলো। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, সে নিজেই জানে না।

দিল্লীর রাজপথ।

অগণিত-পথচারী ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলেছে! সবাই কর্ম ব্যস্ত।

এদিক-সেদিন ছুটে চলেছে অগণিত যানবাহন।

বনহুর আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছে। মনের মধ্যে তার নানা চিন্তাজাল ঘুরপাক খাচ্ছিলো। দৃষ্টি ছিলো তার সম্মুখে। হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে বনহুর ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে।

একটা বৃদ্ধ সাপুড়ে চাপা পড়েছে তার গাড়ির নীচে।

বনহুর দ্রুত নেমে গিয়ে বৃদ্ধকে তুলে ধরলো, মাথায় আঘাত লাগায় লোকটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বনহুর তাড়াতাড়ি তাকে গাড়িতে তুলে নিলো, তারপর চললো হস্‌পিটালে।

হস্‌পিটালে ভর্তি করে দিলো বনহুর বৃদ্ধ সাপুড়েকে। যত টাকা-পয়সা লাগে দেবো আশ্বাস দিলো ডাক্তারকে বনহুর। নিজে বসে রইলো তার পাশে, যতক্ষণ সংজ্ঞা ফিরে না আসে ততক্ষণ বনহুর উঠলো না।

হস্‌পিটালের বড় ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করলেন।

বনহুর বিপুল উদ্বিগ্নতা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার দস্যুপ্রাণ আজ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লো, এক বৃদ্ধ সাপুড়ের জন্য তার মনে শুরু হলো দারুন অস্থিরতা। একি হলো, এমন ভাবে একটা জীবন তার গাড়ির তলায় বিনষ্ট হবে, এ যেন সে ভাবতেও পারেনি। না জানি বৃদ্ধের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন তারা কত আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। হয়তো বা বৃদ্ধ

সাপুড়ের রোজগারের উপরই নির্ভর করছিলো তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব-ভার। এখন কে দেখবে তাদের, কে জোগাবে তাদের মুখে আহার। বনহুর এসব চিন্তা করতে লাগলো।

❑

সেদিন গোটা রাত প্রায় হস্‌পিটালে কাটিয়ে অনেক রাতে ফিরে এলো বনহুর।

স্বপন আর কল্পনা পরদিন উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞসা করলো, কাল কোথায় গিয়েছিলে রঞ্জনদা? কেন ফেরেননি? কোনো বিপদ ঘটে নি তো!

বললো বনহুর—হাঁ, বিপদই ঘটেছিলো। তারপর সব কথা খুলে বললো বনহুর স্বপন ও কল্পনার কাছে।

এরপর থেকে বনহুর রোজ হস্‌পিটালে যাওয়া-আসা শুরু করে দিলো। ঔষধপথ্য, টাকা-পয়সা যা লাগে সব দিতে লাগলো অজস্রভাবে।

চিকিৎসায় একদিন আরোগ্য লাভ করলো বৃদ্ধ সাপুড়ে।

আনন্দ ধরে না বনহুরের। বৃদ্ধ সাপুড়েকে জড়িয়ে ধরে বুকে, তারপর এক থলে টাকা গুঁজে দেয় তার হাতে, বলে তাকে—যতদিন বাঁচবে বসে খেও। সাপ খেলা আর তোমাকে দেখাতে হবে না।

আনন্দে বৃদ্ধ সাপুড়ের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠে। খুসী হয় সাপুড়ে বৃদ্ধ বনহুরের ব্যবহারে। তাদের সাপুড়ে ভাষায় আশীর্বাদ করে সে তাকে।

বনহুর তো অবাক।

তার গাড়ির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ যাচ্ছিলো, অথচ তাকেই এতো সমীহ! বললো বনহুর—চলো তোমাকে তোমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাপুড়ে বললো—আপনার বড় দয়া বাবুজী।

বনহুর নিজের গাড়িতে তুলে নেয় সাপুড়ে বৃদ্ধকে।

শহরের শেষ প্রান্তে সাপুড়ে পল্লী।

বনহুর গাড়ি ড্রাইভ করে চলেছে।

পিছন আসনে বসে আছে সাপুড়ে বৃদ্ধ।

শহরের মধ্যপথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুরের গাড়ি শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছলো।

এক জায়গায় কতগুলো লোক হইহুল্লোড় করে চীৎকার করছে। সমস্ত কণ্ঠ ছাপিয়ে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেলো—বাঁচাও, বাঁচাও......

বৃদ্ধ সাপুড়ে বলে উঠলো—বাবুজী, আমার ম্যাইয়াকে কেউ ধরিয়া নিয়া যাইতেছে। ঐতো হামার ম্যাইয়ার আওয়াজ পাইতেছি। বাবুজী ঐ যে দেখা যাইতেছে।

বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো সম্মুখের ভীড়ের দিকে কিছুদুরে। দেখলো একটা সাহেবী পোশাক-পরা লোক একটি ঘাগড়া-পরা মেয়েকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুলছে।

বনহুর মুহূর্তে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। দ্রুত এগিয়ে চললো ভীড় ঠেলে। কিন্তু সে গাড়ির নিকটে পৌঁছবার পূর্বেই লোকটা মেয়েটিকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

সাপুড়ে ততক্ষণে নেমে এসে বনহুরের পা জাপটে ধরলো। বাবুজী বাঁচাইয়া নিন। ওকে বাঁচাইয়া নিন বাবুজী......

বনহুর কোনোদিকে লক্ষ্য না করে ক্ষিপ্রগতিতে এসে গাড়িতে চেপে বসলো, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

সম্মুখের গাড়ি তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গাড়িতে দু'জন আছে বুঝতে পারে বনহুর। কোনোদিকে না তাকিয়ে সামনের গাড়িখানাকে ফলো করে চললো সে। অগণিত ভীড়ের মধ্যে সাবধানে তাকে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, কিন্তু সামনের গাড়িখানা যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায় সেদিকে বনহুরের তীব্র নজর রয়েছে।

সামনের গাড়িখানা শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো বাইরের বাঁকা পথ ধরে। বনহুর এবার খুসী হলো, এতে তার সুবিধা হলো আরও বেশি, কারণ এখন গাড়ি চালাতে তাকে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না।

সম্মুখের গাড়ি তীরবেগে ছুটে চলেছে। পাকা সড়ক ত্যাগ করে মেঠো পথ ধরে গাড়িখানা অগ্রসর হলো।

বনহুরের গাড়িও নেমে পড়লো মেঠো পথে।

উঁচু-নীচু অসমতল পথ।

হঠাৎ সম্মুখে আর একটি পথ দেখতে পেয়ে বনহুর সে পথে ডবলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিলো। এবং কৌশলে সম্মুখস্থ গাড়ির পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বাধ্য হলো শয়তান দুষ্ট লোক গাড়ি থামিয়ে ফেলতে।

বনহুর লাফিয়ে নেমে পড়লো, তরপর দ্রুত ছুটে গিয়ে গাড়ির ড্রাইভ্ আসন থেকে লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিলো। তারপর চললো ঘুসির পর ঘুসি। তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হলো।

গাড়ির মধ্যে ছিলো দ্বিতীয় এক ব্যক্তি। সে-ই মেয়েটিকে এঁটে ধরে ছিলো।

বনহুর আর ড্রাইভার যখন ধস্তাধস্তি হচ্ছিলো তখন লোকটা মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালাবার আয়োজন করছিলো। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সে মেয়েটিকে।

বনহুর ড্রাইভারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলেও তার দৃষ্টি ছিলো মেয়েটির দিকে। এবার সে ড্রাইভারকে পরপর কয়েকটা ঘুসি লাগিয়ে কাবু করে ফেলে ছুটে চলে যে দুষ্ট লোক মেয়েটি নিয়ে পালাচ্ছিলো তার দিকে।

লোকটা মেয়েটিকে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে জঙ্গলের দিকে!

বনহুর ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে লোকটা আক্রমণ করলো বনহুরকে।

শুরু হলো আবার মল্লযুদ্ধ।

সেকি ভীষণ লড়াই!

ধূলো-মাটি আর বালির মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি।

বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠে সাধ্য কার!

বনহুরের ঘুসি খেয়ে অল্পক্ষণেই দুষ্ট লোকটার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। এবার সে ভোঁ দৌড় দিলো জঙ্গলের দিকে।

লোকটা পালিয়ে যেতেই বনহুর ফিরে দাঁড়ালো।

অমনি ছুটে এসে বনহুরের বুকে ঝাপিয়ে পড়লো মেয়েটি।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—নূরী!

হুর, কোথায় ছিলে তুমি এতোদিন?

বনহুর এবার গম্ভীর হয়ে পড়লো, নূরী প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বললো—কেশব কোথায়?

ও আছে। হুর, আমি ভাবতেও পারিনি, তুমি এসময় আসবে। কোথায় এতোদিন ছিলে বলো তো?

বনহুর কোনো জবাব দিলো না, বললো—চলো কেশবের নিকটে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বনহুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হলো।

নূরী পিছনে পিছনে এগুলো।

ড্রাইভ আসনে বনহুর উঠে বসতেই, নূরী তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো—হুর, তুমি কোথায় ছিলো এতোদিন? আমি যে তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে পড়েছি।

হেসে উঠলো বনহুর.....অট্টহাসি। তারপর হাসি থামিয়ে দাঁত পিষে বললো—পাগল! জানতাম না তোমার মধ্যে এতোখানি ছলনা লুকিয়ে ছিলো।

হুর, একি বলছো তুমি! আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। গাড়ি ছুটে চলে শহর অভিমুখে।

নূরী কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো—কথা বলছো না কেন? কি হলো তোমার হুর, বলো?

বনহুর তবু নীরব।

নূরী হ্যাণ্ডেলের উপর বনহুরের হাতখানা চেপে ধরে—বলো কি ছলনা আমি করেছি তোমার সঙ্গে? বলো জবাব দাও?

বনহুরের মুখমণ্ডল রাগে রক্তের মত লাল হয়ে উঠছে। অধর দংশন করছে সে।

নূরী এবার ব্রেক কষে ধরলো—জবাব না দিলে আমি তোমাকে গাড়ি চালাতে দেবো না।

নূরী! কঠিন কণ্ঠে বনহুর গর্জে উঠলো।

হুর, বলো আমি কি অন্যায় করেছি যার জন্য তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছো?

এবার বনহুর গাড়ি থামিয়ে ফেললো, গম্ভীর গলায় বললো—কেন তুমি আমাকে পূর্বে বলেছিলে না কেশবকে তুমি ভালবাসো? আমি তাহলে তোমাকে স্পর্শ করতাম না।

নূরী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—হুর!

আমার কাছে কোনোরকম মিথ্যা কথা বলবে না নূরী।

তুমি বিশ্বাস করো, কেশবকে আমি ভালবাসি কিন্তু ভাই-এর মত। হুর তোমার নূরী কোনোদিন অপরের হবে না বা হতে পারে না। এখনও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না।

বনহুর বললো—কেশবের সঙ্গে তোমার যদি ভাই-এর সম্বন্ধ, তাহলে ওর সঙ্গে কেন তুমি পালিয়েছিলে?

কে বললো আমি কেশবের সঙ্গে পালিয়েছি? হুর, একথা তুমি ভাবতে পারলে? এবার বুঝতে পেরেছি সব......বলো তুমি কতদিন পর সেই জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিলে?

কয়েকদিন পর জঙ্গলে ফিরে গিয়ে তোমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি।

ওঃ তুমি তাহলে আবার গিয়েছিলে? আজ আমি সব কথা বলবো তোমাকে। বাবাজী মরে যাবার পর তোমার জন্য দুদিন অপেক্ষা করেছিলাম আমরা সেই জঙ্গলে, কিন্তু বাবাজী নেই, তুমি নেই—শুধু কেশব ভাই আর আমি কি করে ঐ জঙ্গলে দুটি প্রাণী বাস করি বলো? তার তোমার সন্ধানে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। তারপর থেকে খুঁজে ফিরছি তোমাকে। এক সাপুড়ে সর্দার আমাকে কন্যার মত স্নেহ করে, তাই তার ওখানেই আমরা থাকি।

বনহুর নূরীর পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করে ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললো—পেট চালানোর জন্য নাচনেওয়ালী সেজেছো, না?

হ্যাঁ, মিথ্যা আমি কোনোদিন তোমাকে বলিনি; কোনোদিন বলতে পারবো না।

বেশ তো, ভালই এক পথ বেছে নিয়েছো। চলো তোমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

আর তুমি?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো এবার—আমার অনেক কাজ আছে।

না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না, হুর, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

নূরী, আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

কেন?

পরে বলবো, আজ চলো তোমাকে কেশবের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তাই চলো তবে।

গাড়ি পুনরায় চলতে শুরু করলো।

নূরী বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে বললো—হুর, আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে জানো? আকাশের চাঁদ পেলেও এতো খুসী হতাম না। ইস, কি যে আনন্দ......

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে, বিশেষ করে নূরীকে পেয়ে সে নিজেও কম খুসী হয়নি! তবু নিজেকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর রাখার চেষ্টা করে বনহুর।

নূরী বলে আবার—হুর, আমাকে রেখে চলে যাবে—আবার আসবে তো?

[illegible] করবো।

না, সত্যি করে আমাকে কথা দিয়ে যেতে হবে। যদি আবার এসো তবেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।

আসবো।

শপথ করো আমাকে স্পর্শ করে?

গাড়ি চালাচ্ছি, দেখছো না আমার দু'হাত বন্ধ?

নূরী দুটি বাহু দিয়ে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে—বলো সত্যি?

হেসে বলে বনহুর—সত্যি!

বনহুরের মুখের হাসি নূরীর গোটা মনে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্ছল হয়ে উঁঠে [illegible]ী, বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে—আমার হুর!

সাপুড়েদের আস্তানায় পৌঁছবার পূর্বে বনহুর নূরীকে নিয়ে ফিরে আসে এক জায়গায়, যেখান থেকে নূরীকে জোর করে দুষ্ট লোক দুটো ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর আর নূরী ফিরে এসে দেখলো, সাপুড়ে সর্দার নূরীর জন্য মাথা ঠুকে বিলাপ করছে.....সত্যি সে নূরীকে এতোখানি ভালবেসে ফেলেছিলো! কেশবও অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে।

চারদিকে ঘিরে ধরেছে অসংখ্য জনতা।

বনহুর আর নূরী নেমে দাঁড়াতেই সাপুড়ে সর্দার বনহুরকে জড়িয়ে ধরলো—বাবুজী, তুই বহুৎ ভাল কাম করিয়ছিস্। হামার মাইয়ারে তুই বাঁচাইয়া নিয়াছিস্.....

কেশব তো বনহুরকে দেখতেই ছুটে এসে জাপটে ধরলো—বাবু তুমি? তুমি ফুলকে উদ্ধার করেছে। !

অগণিত জনতা সবাই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছে।

এমন সময় রংলাল কোথা থেকে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে, বনহুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—হামাদের মাইয়্যাকে তুমি বাঁচাইবার কে। তুমি নিজের পথ দেখো।

বনহুর তখন প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নি সংযোগ করে নিলো, তারপর একমুখ ধূয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—তুমি কে?

বুক ফুলিয়ে, দক্ষিণ হস্ত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বললো রংলাল—হামি হীরালালের ভাতিজা রংলাল। হামাকে এ গাঁয়ের সবাই ভয় করে। আইসেছো, আর কোনোদিন এ পথে পা দিবে না।

রংলালের কথায় বনহুরের রাগ চরমে উঠে, পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে বলে—আসবো, হাজার বার আসবো, তাতে তোমার কি?

খবরদার, এলে জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না......

রংলালের কথা শেষ হয় না, বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের ভয়ংঙ্কর একটি ঘুষি গিয়ে পড়ে তার নাকের উপর, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ে রংলাল ভূতলে।

এতোক্ষণে রংলাল বুঝতে পারে, যার সঙ্গে সে তাচ্ছিল্যভাবে কথা বলছে সে সাধারণ লোক নয়। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় রংলাল, নাক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার।

বনহুর কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে একবার রংলালের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে।

গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

সাপুড়ে সর্দার হীরালাল ফিরে তাকায় রংলালের মুখে। রাগে-ক্ষেভে অধর দংশন করে বলে সে—এতো বড় হারামি লোক তুই, বাবুজী ফুলেরে বাঁচাই নিলো আর কিনা.....

হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে ফেলেছিলো রংলাল, দাঁত-মুখ খিচিয়ে বললো—জানো, ও বাবুজী তুহার ফুলের রূপ দেইখ্যা পাগল হই গেছে। তাই তো ওহারে বাঁচাইয়া নিছে......

খুব ভাল কাম করিয়াছে। বাবুজী তো তোমার মত শয়তান আছে না। চল্ মাই ফুল, ঘর চল্।

সাপুড়ে সর্দার হীরালাল নূরী আর কেশবকে নিয়ে ফিরে যায় তাদের সাপুড়ে পল্লীতে।

❑

বনহুরের দেখা পেয়েছে নূরী—আর কি তার মন স্থির থাকে! সব সময় তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে সে। দিন যায়, রাত আসে—রাত যায়, দিন হয়।

চঞ্চল হয়ে উঠে নূরী।

গভীর রাতে সমস্ত সাপুড়ে পল্লী যখন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে তখন নূরী শয্যা ত্যাগ করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে বাইরে।

কুঠিরের দাওয়ায় শোয় কেশব। সে যেন জেগে না উঠে তাই পায়ের নূপুর জোড়া খুলে রাখে বালিশের তলায়।

সাপুড়ে পল্লীর অদূরে বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা আছে, আশেপাশে আছে ছোট-বড় কিছু সংখ্যক শাল, পিয়াল আর দেবদারু গাছ।

নূরী দস্যু-কন্যা, সাহসী তার প্রাণ। ভয় বলতে কিছু জানে না সে। এগিয়ে যায় নূরী সেই নির্জন ফাঁকা প্রান্তরে। উঁচু একটা স্থানে দাঁড়িয়ে ইংগিতপূর্ণ শব্দ করে। সুমিষ্ট কণ্ঠের মিষ্টি একটা সুর ছড়িয়ে পড়ে সাপুড়ে পল্লীর চারদিকে।

নূরী তার আকুল কণ্ঠে আহ্বান করে বনহুরকে। যদি সে ফিরে যায়, চিনতে না পারে তার কুঠির।

প্রহর কেটে যায়।

নূরীর আশা সফল হয় না। আসে না তার আকাঙ্খিত জন। শেষ রাতের আকাশে জেগে উঠে ধ্রুবতারা, ফিরে আসে নূরী নিজের কুঠিরে, বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে নূরীর তেলচিটে বালিশটা।

হঠাৎ কারো করস্পর্শে চমকে উঠলো নূরী। মুখ মুলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলোতার চোখ দুটো। অস্পষ্ট স্বরে বললো—হুর!

নূরী! বনহুর ওর নামটা উচ্চারণ করলো। তারপর ওকে নিবিড় করে টেনে নিলো কাছে।

নূরীর আনন্দ-অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো, ভিজে গেলো বনহুরের জামার কিছু অংশ।

গভীর আবেগে বনহুর বললো—কেন কাঁদছিলে?

বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো নূরী—সেই যে চলে গেলে, কই তারপর তো একদিন এলে না?

অনেক কাজ ছিলো নূরী, শেষ করলাম।

চিরদিন তোমার কাজ আর কাজ। অবসর হবে না?

এবার হয়েছি, তোমাকে নিতে এসেছি নূরী। চলো আবার আমরা ফিরে যাই কান্দাই নগরে। রহমান কেমন আছে, আমার অনুচরগণ সবাই কেমন আছে কে জানে! তাজ হয়তো এতোদিনে শুকিয়ে মরে গেছে। নূরী, আর আমি দেশে থাকতে চাই না.....

তোমার মত আমার মনও অস্থির হয়ে উঠেছে হুর। কতকাল আমি জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছি। আমিও যেতে চাই।

তবে চলো আমার সঙ্গে, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

তা হয় না হুর। সাপুড়ে বাবা আমাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করে, তাকে না বলে কি করে যাবো বলো? তাছাড়া কেশব ভাইকে একা ফেলে আমার যাবার উপায় কই?

নূরী, সাপুড়ে সর্দার যদি কোনোরকম আপত্তি করে বসে?

না না, বাবা তেমন লোক নয়।

সেদিনের সেই দুষ্ট লোকটা.....

রংলাল! ওর কথা রেখে দাও। তুমি যদি পাশে থাকো তাহলে কাউকে ভয় করি না।

নূরী!

বলো?

ভোর হয়ে এলো প্রায়।

হাঁ। ভোর হয়ে আসছে।

বনহুর ওকে বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো। মুখখানা নেমে এলো ওর মুখের কাছে, আবেগভরা কণ্ঠে ডাকলো—নূরী!

বললো নূরী—ছিঃ, বাইরে কেশব ভাই আছে।

তাকে বলেই আমি এসেছি, কাজেই......

তাই তো এতো স্পর্ধা তোমার!

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় নূরীর গলায়, চমকে উঠে বনহুর। লণ্ঠনের আলোতে নূরীর গলায় মনিরার দেওয়া চেন-মালাটাই তার নজরে পড়েছে।

বনহুর নূরীকে মুক্তি দিয়ে লণ্ঠনটা তুলে নেয় হাতে। সলতে বাড়িয়ে উঁচু করে ধরে নূরীর গলার কাছে, তারপর বামহস্তে চেন-মালাটা উল্টেপাল্টে দেখে এক জায়গায় চাপ দিয়ে ঢাক্‌নাটা খুলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ছোট্ট দুটি মুখ বেরিয়ে আসে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—নূরী, এ মালা তুমি কোথায় পেলে?

নূরীও অবাক হয়ে গেছে, সে জানতো না চেনের লকেটের মধ্যে দুটি শিশুর মুখ লুকিয়ে আছে। এমনি একটা চেন-মালা সে তার হুরের গলায় দেখেছিলো, সে কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলো নূরী। আজ স্মরণ হয় স্পষ্টভাবে। বলে নূরী—আমার নাচ দেখে খুশী হয়ে এক যুবতী আমাকে এ মালা দান করেছে।

যুবতী!

হাঁ। কিন্তু এ মালা যে তোমার গলায় ছিলো?

যদিও জামার নীচে আজও বনহুরের গলায় তার সেই দস্যু-পিতা কালু খাঁর দেওয়া স্মৃতি চেন-মালাটা পরা রয়েছে, তবু সে-কথা গোপন রেখে বললো বনহুর—আমার মালাটা চুরি গিয়েছিলো। বলো, বলো নূরী কে সে যুবতী? কোথায় থাকে সে?

আমি ঠিক জায়গাটা খেয়াল করতে পারবো না, তবে কেশব ভাই বলতে পারবে। চলো হুর, রাত ভোর হয়ে গেছে; কেশবের কাছে জেনে নেবে চলো।

তাই চলো নূরী।

বনহুর আর নূরী কুঠিরের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো।

কেশব ঘুম থেকে জেগে উঠেছে অনেকক্ষণ, বনহুর আর নূরীর আগমনে উঠে বসলো।

বনহুর বললো—কেশব, নূরীর গলায় এ মালা কে দিয়েছে জানো?

কেশব নূরীর মালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—ও মালা এক মহিলা দিয়েছেন ওর নাচ দেখে খুশী হয়ে।

সে কথা আমি শুনেছি। আমি জানতে চাইছি কে সে মহিলা? কোথায় থাকে সে? আমি তার পরিচয় জানতে চাই।

বেশ তো বলছি—সেলুকা রোড আছে না?

হাঁ আছে। বললো বনহুর।

ঐ রোড দিয়ে কিছুদূর গেলে সাবেরা কোয়ার্টার আছে। তার ওদিকে.......

অতো বলতে হবে না, একবার বলো—আমি দিল্লীর সব পথঘাট চিনি।

পুলিশ সুপারের বাংলো চেনো বাবু?

আচমকা একটু চমকে উঠলো যেন বনহুর, বললো—হাঁ-হাঁ চিনি।

ঐ বাংলোয় ফুল নাচ দেখিয়েছিলো তাই বেগম সাহেবা ঐ মালাটা দিয়েছেন।

বলে উঠে নূরী—বেগম সাহেবা না কে জানি না, দু'জন মেয়ে ছিলো; তার মধ্যে একজন টাকা দিয়েছিলো আর একজন এই মালাটা।

হাঁ তারপর?

তারপর আবার কি, ঐ তো মালা নিয়ে চলে এলাম খুশী হয়ে। তখন কি আমি খেয়াল করেছি এ মালা তোমার?

নূরীর কথায় বলে উঠে কেশব—কি বললো ফুল? ও মালা তোমার বাবুর?

হাঁ কেশব, এ মালা আমার।

তাহলে ওটা কি করে.....

বললো নূরী—চুরি গিয়েছিলো।

বনহুরের মনে তখন নানারকম চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়েছে। এ মালা যে তার মনিরার কণ্ঠে বস সময় পরা থাকে। এ মালা ভারতে এলো কি করে? পুলিশ সুপারের বাড়ির মহিলার কণ্ঠেই বা গেলো কি করে? তবে কি ঐ বোরখাধারিনী তার মনিরা? বনহুরের কানে বোরখাধারিনীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বেজে উঠে। তাই তো, আজ যেন মনে হচ্ছে—ও স্বর তার কত পরিচিত। এতোদিন বনহুর ভাবতেও পারেনি—তার মনিরা এই সুদূর ভারতে আসতে পারে।

বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো নূরী, বললো সে—হঠাৎ কি হলো তোমার হুর?

আনমনা ভাবে উচ্চারণ করলো বনহুর—উঁ।

মালা তো পেয়েছো আর কি?

হাঁ মালা পেলাম, কিন্তু চোরকে শায়েস্তা না করে ছাড়বো ভেবেছো?

কি দরকার। বড় ভাল মেয়ে বলেই আমার মনে হলো।

ওঃ বখসীশ মোটা পেয়েছিলে তাই এতো দরদ! আচ্ছা বলো তো, বাংলোয় দুটো মেয়ে থাকে—একজন বোরখা পরে আর একজন অতো পর্দার বাড়াবাড়ি নেই, কোন্ জনা তোমাকে এ মালা খুশী হয়ে দিয়েছিলো?

চট করে বললো নূরী—যে বোরখা পরে থাকে সেই দিয়েছে।

হুঁ এবার বুঝেছি। বনহুর কথাটা বলে মৃদু হাসে।

নূরী বলে—দেখো আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তাকে জানে মেরো না।

তাহলে বন্দী করে নিয়ে আসবো?

তাই এনো।

কিন্তু তুমি কিছু মনে করে বসবে না তো?

না।

বেশ তাই করবো।

বনহুর ভাবে, নূরী ইতিপূর্বে কান্দাই জঙ্গলে মনিরাকে বেশ কিছু সময়ের জন্য দেখেছিলো। তার জন্যই বনহুরকে সে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলো। নূরী সব ভুলে গেছে, ভুলে গেছে সম্পূর্ণভাবে মনিরার চেহারা। সরল সহজ মেয়ে নূরী.....হাসে বনহুর।

নুরী বলে—হাসলে কেন?

হাসলাম, একটা নারী সে কি করে একজন পুরুষের গলার চেন চুরি করলো?

কেশব অবাক হয়ে বললো—ও চেন বাবুর?

বললো নূরী—হাঁ, ও চেন-মালা ওর।

বনহুরের আর বিলম্ব সইছিলো না, নূরীকে নিয়ে সে বিদায় নেবে দিল্লী নগরী থেকে ভেবে এসেছিলো আজ—কিন্তু সে আর হলো না।

বনহুর বললো—নূরী, আজ তাহলে চললাম।

যাও কিন্তু মেয়েটিকে যেন হত্যা করো না।

না, ওকে নিয়ে আসবো তোমার কাছে।

তাই এনো।

বনহুর কেশবের করমর্দন করে বিদায় নিলো।

❑

বনহুর সেদিন স্বপন আর কল্পনার নিকটে বিদায় চেয়ে বসলো—এবার তোমাদের মায়াজাল আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে হচ্ছে ভাই।

অবাক হয়ে বললো স্বপন আর কল্পনা—তার মানে?

মানে আমাকে এবার বিদায় নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে দুরে—অনেক দুরে।

বনহুরের কথা শুনে স্বপন আর কল্পনার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তারা ভাবতেও পারেনি রঞ্জনদা একদিন তাদের ছেড়ে চলে যাবে। প্রায় কেঁদে ফেললো দু'জনা।

স্বপন বললো—রঞ্জনদা, আপনি চয়ে যাবেন? কিন্তু আমাদের কে দেখাশোনা করবে বলুন তো?

হেসে বলে বনহুর—এখন তোরমা বড় হয়েছো। জ্ঞান-বুদ্ধি অনেক বেড়েছে। তাছাড়া তোমাদের যে সব কর্মচারী বা আত্নীয়-স্বজন আছে সবাই তোমাদের সমীহ করে। কাজেই আমি না থাকলে কোনো অসুবিধাই হবে না তোমাদের।

শেষ পর্যন্ত বনহুরকে বিদায় দিতে হল স্বপন আর কল্পনাকে।

ওদের ছেড়ে যেতে বনহুরের যে কষ্ট হচ্ছিলো না, তা নয়। কিন্তু কি করবে সে—বনহুরের স্বভাব নয় স্থির হয়ে চিরদিন এক স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকা। এমন কোনো শক্তি নেই তাকে ধরে রাখতে পারে।

বনহুর স্বপন আর কল্পনার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেও সে সত্যিই একেবারে দুরে চলে গেলো না। কারণ এখনও তার কিছু কাজ বাকী আছে।

দিল্লীর অনতিদুরে এক নির্জন স্থানে সে একটি বাড়ি ভাড়া নিলো। বাড়িখানা বহুদিনের পুরানো বাদশাদের আমলের তৈরি। এককালে বাড়িখানার জৌলুস ছিলো। রাজ প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ি। সিংহাদ্বারের পরেও পর পর কয়েকটি দ্বার আছে। এককালে এ সব দ্বারে খোজা দারওয়ান পাহারা থাকতো। ভিতরে ছিল বেগম মহল। হয়তো কোনো রাজা বা বাদশাহ সখ করে নির্জন স্থানে বসবাস করবার জন্য এ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। আজ পূর্বের ন্যায় সুন্দর আর ঝকঝকে নেই, ভেংগে ধসে পড়েছে অনেক জায়গা। সিংহদ্বারের উপরে জন্মেছে অসংখ্য আগাছা।

বনহুর এ বাড়িটাই ভাড়া নিলো এক মহাজনের নিকট হতে। এ বাড়ির আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই, নেই কোনো লোকজনের বসবাস।

এ বাড়িটাই বনহুরের পছন্দ হলো।

দিল্লীতে বাকী যে ক'দিন কাটাবে এ বাড়িটাই তার এখন প্রয়োজন। এ বাড়িল ভিতরে ঘুরেফিরে দেখে নিজের পছন্দ মত একটা ঘর বেছে নিয়েছে থাকার জন্য। শুধু একা বনহুর থাকবে। ঘরটা ঠিক্ মাঝের একটা ঘর, ভাংগাচুরা তেমন নয়, পরিস্কারও বটে।

বনহুর এ ঘরেই তার আস্তানা গাড়লো।

বাড়িখানার আশেপাশে বেশ জনভূমি এবং উঁচু-নীচু জায়গা। ঝোপঝাড়ও জন্মেছে অনেক। বনহুরের এ সব পছন্দই হলো। সে তার গাড়িখানা রাখবার জন্য গ্যারেজ না পেলেও ভাঙ্গা ধসে-পড়া ঘর পেলো ঠিক্ গ্যারেজের মতই। বনহুর তার উপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিলেও এখনও তার নিকটে যে সোনা-দানা, মনি-মুক্তা ছিল তা কোটি কোটি টাকা মূল্যের চেয়েও বেশি হবে।

বনহুর এসব মূল্যবান মনি-মুক্তা, সোনা-দানা লুকিয়ে রাখলো তারই কক্ষের এক গোপন প্রকোষ্ঠে। ইচ্ছামতো সে বিলিয়ে দিতো দীনদুঃখী আর অনাথদের মধ্যে।

নিজের প্রয়োজন তার কতটুকুই বা লাগতো! তবু বনহুরের স্বভাব—যদি কোনো দুষ্ট ধনপতির সন্ধান পেতো, যেমন করে হোক তার সর্বস্ব লুটে নিতে দ্বিধা বোধ করতো না সে এতটুকু।

স্বপন আর কল্পনাদের বাড়ি ত্যাগ করে চলে এলেও বনহুর এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের বেশে মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের সব খোঁজ-খবর নিয়ে আসতো।

স্বপন আর কল্পনা এতটুকু বুঝতে পারতো না কিন্তু বৃদ্ধের ব্যবহারে আত্মহারা হয়ে যেতো। বনহুর বৃদ্ধ সেজে তাদের বাবার কাকার বলেই পরিচয় দিয়েছিলো।

স্বপন আর কল্পনা সরল বিশ্বাসে তাকে স্থান দিয়েছিলো অন্তরে। বৃদ্ধ রায়বাবুর বেশে যখন যেতো বনহুর তখন স্বপন আর কল্পনার আনন্দের সীমা থাকতো না। কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে—ভেবে আকুল হতো ওরা।

বনহুরও বৃদ্ধের মত গলা কাঁপিয়ে কথা বলতো, স্নেহ-আদরে ভরে দিতো দুটি ভাই-বোনকে। যতক্ষণ ওদের মধ্যে থাকতো পরম আনন্দে সময় কাটতো তার।

❑

বেশ কয়েকদিন রঞ্জন বাবুর সন্ধান না পেয়ে পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী এবং তার পরিবারবর্গ উদ্বিগ্ন হলো। কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো রঞ্জন বাবুর! বেশি করে চিন্তিত হলো মনিরা—হঠাৎ এমন করে কোথায় নিখোঁজ হলো!

একদিন মনিরা আর মাসুমা হাজির হলো গিয়ে স্বপন আর কল্পনাদের বাড়িতে।

স্বপন আর কল্পনা মনিরা আর মাসুমাকে দেখে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো।

হলঘরেই তারা বসেছিলো। তাদের রায় দাদু এসেছেন। তার কাছেই বসে গল্পসল্প করছিলো ওরা।

বনহুর রায়বাবু সেজে স্বপন আর কল্পনাকে নিয়ে মেতে থাকলেও তারও মন ছিলো ঐ বোরখাধারিনীর সন্ধানে। সে বুঝতে পেরেছে, ঐ বোরখার নীচেই রয়েছে তার মনিরা। তাই রঞ্জন যখন স্বপন আর কল্পনাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলো তখন সে বাংলোয় কাউকে বলে গেলো না। কারণ তার মনে ছিলো একটু দুষ্ট অভিসন্ধি।

আজও মনিরা বোরখা পরে এসেছে।

কল্পনা আর স্বপন মনিরা আর মাসুমার সঙ্গে দাদু রায় বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলো।

ইনি আমাদের বাবার কাকা রায় দাদু। আর এঁরা পুলিশ সুপারের বাড়ি থেকে এসেছেন। কথাটা বললো স্বপন।

রায়বাবু শুধু মাথা নেড়ে তাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন।

একজন বৃদ্ধের কাছে লজ্জার কি আছে। তাই মাসুমা আর মনিরা হলঘরেই বসলো।

মাসুমা বললো—স্বপন, তোমার রঞ্জনদাকে দেখছি না তো? তিনি কোথায়?

স্বপন আর কল্পনার চোখ অশ্রু ছলছল হলো। বললো স্বপন—রঞ্জনদা আজ ক'দিন হলো চলে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা বোরখার মুখের আচ্ছাদনটা সরিয়ে ফেলে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—চলে গেছেন!

মাসুমাও অবাক হয়ে বললো—রঞ্জন বাবু চলে গেছেন?

হাঁ, তিনি তো আমার কাছে চিরদিন থাকতে পারেন না। তার অনেক নাকি কাজ আছে, তাই তিনি চলে গেছেন।

মনিরা আর মাসুমা উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে। ব্যথা-বেদনার মুহূর্তে মনিরার মুখ করুণ হয়ে উঠেছে। রায়বাবুর বেশে স্বয়ং দস্যু বনহুর তাদের সম্মুখে উপবিষ্ট। বনহুর বহুদিন পর আজ প্রথম দেখলো মনিরার মুখমণ্ডল। খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো বনহুরের আঁখি দুটি! মনিরার ব্যথাকাতর মুখোভাব তাকে আরও চঞ্চল করে তুললো। ওকে নিবিড়ভাবে পাবার জন্য ব্যাকুল হলো তার হৃদয়।

বললো মাসুমা—সর্বনাশ হয়ে গেছে মনিরা। না জানি কোথায় সে চলে গেছে কে জানে!

মনিরা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে উচ্ছসিতভাবে।

রঞ্জন বাবু চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে মাসুমা আর মনিরার ভাব লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেছে স্বপন আর কল্পনা। এবার মনিরাকে রোদন করতে দেখে আরও অবাক হয়। রঞ্জন বাবুকে তারাও ভালবাসতো কিন্তু তাই বলে পুলিশ সুপারের স্ত্রী, বোন—এরা তার জন্য কাঁদবে কেন!

মনিরাকে মাসুমা হাশেম চৌধুরীর বোন বলেই পরিচয় দিতো সবার কাছে। স্বপন আর কল্পনাও জানতো—আলেয়া পুলিশ সুপারের বোন।

মনিরা বললো এবার—রঞ্জন বাবু কোথায় গেছেন বলে গেছেন কিছু?

স্বপন জবাব দিলো—না, তিনি কোথায় গেছেন বলে যাননি।

এরপর বেশিক্ষণ মাসুমা আর মনিরা স্বপনদের বাড়িতে অপেক্ষা করলো না।

বিদায় নিয়ে চলে গেলো ওরা।

রায়বাবুও উঠে পড়লেন—আজ চলি কেমন?

স্বপন আর কল্পনা আপত্তি তুললো, এক্ষুণি চলে যাবেন রায়দাদু। আরও কিছু সময় থেকে যান না?

না ভাই, আজ আর দেরী করবো না, আসবো আবার। রায়বাবুবেশী দস্যু বনহুর বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

❑

পেয়েও তাকে হারাবো ভাবতে পারিনি মাসুমা। মাসুমার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠে মনিরা।

মাসুমা ওর মাথায়-পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—হয়তো দিল্লী নগরীতেই আছে সে, অধৈর্য্য হচ্ছো কেন বোন!

না, সে দিল্লীতে থাকলে নিশ্চয়ই স্বপন আর কল্পনাদের ওখান থেকে যেতো না। বড্ড খেয়ালী—হয়তো চলে গেছে দুরে কোথাও।

যদি তোর কথা মনে পড়ে থাকে তাহলে দেশেও চলে যেতে পারে।

মিথ্যা নয় মাসুমা। আমার মন যেন বলছে সে আবার ফিরে গেছে কান্দাই শহরে। আমাকে যদি গিয়ে না পায় তাহলে কি হবে মাসুমা?

আমি বলেছিলাম এবার ওকে পরিচয় দে। বেশীদিন এমন করে নিজেকে বঞ্চিত রাখিস্ না মনিরা, কিন্তু তুই আমার কথায় কান দিস্‌নি এবার হলো তো?

মাসুমা, আমি দেখতে চেয়েছিলাম কেন সে সুদূর কান্দাই থেকে এই ভারতবর্ষে আত্মগোপন করে আছে। কেন সে নিজেকে রঞ্জন বাবু সাজিয়ে হিন্দু ভদ্রলোক সেজেছেন। কিন্তু সব আমার ব্যর্থ হয়ে গেলো মাসুমা, আমি নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করলাম।

মনিরার বেদনা-বিধুর দিনগুলো এমনি নিরানন্দভাবে কেটে চললো।

বান্ধবীর মনঃকষ্টে মাসুমার মনেও শান্তি নেই, সব সময় কেমন একটা থমথমে ভাব বাংলোতে বিরাজ করতে লাগলো।

স্ত্রী এবং মনিরার গম্ভীর চিন্তাযুক্ত ভাব দেখে হাশেম চৌধুরীও উদ্বিগ্ন হলেন, ব্যাপার কি—বাংলোয় যেন কেউ মারা পড়েছে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর জেদে মাসুমা সব কথা তাকে খুলে বলতে বাধ্য হলো।

ঘটনা শুনে হাশেম চৌধুরী হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। এমন একটা ব্যাপার অথচ তিনি তার কিছু জানেন না। জানলে আজ এমন হতেও পারতো না। কবে তিনি ওদের দু'টিকে মিলন সূত্রে গেঁথে দিতেন।

হাশেম চৌধুরীও এবার রঞ্জন বাবুর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

❑

সেদিন হাশেম চৌধুরী স্বয়ং গাড়ি নিয়ে বের হলেন, সন্ধান করে ফিরলেন সমস্ত দিল্লী নগরী কিন্তু রঞ্জন বাবুর সন্ধান তিনি পেলেন না।

বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন তার ড্রাইভার হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় নতুন এক শিখ ড্রাইভার এসেছে তার জায়গায়। দোহারা লম্বা চেহারা, মাথায় পাগড়ী, মুখে চাপদাড়ি। চোখে চশমা, হাতে লোহার এক গাছা বালা। বিশেষ করে শিখ ড্রইভারের চোখ দুটি তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হলো।

হাশেম চৌধুরী নাম জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি ড্রাইভার?

শিখ ড্রাইভার বললো—শিবাজী।

বাঃ বহুৎ আচ্ছা নাম তোমহারা—হেসে বললেন হাশেম চৌধুরী।

শিখ ড্রাইভারটির ব্যবহারে খুসী হলেন হাশেম চৌধুরী। যেমন চেহারা, তেমনি অমায়িক লোক।

কয়েকদিনেই সে অনেকটা আপনজনের মত হয়ে গেলো। ভাল বাংলা বলতে পারে না সে, ভাংগা ভাংগা উর্দু কথা বলে।

শিখ ড্রাইভারের ছদ্মবেশে বনহুর স্বয়ং এসে হাজির হয়েছে পুলিশ সুপারের বাংলোয়। উদ্দেশ্য মনিরাকে একবার আয়ত্তের মধ্যে আনা; তাকে যেমন নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে তেমনি ওকেও খানিকটা কাঁদিয়ে তবে ছাড়বে।

মনিরার চোখের পানি মাঝে মাঝে বনহুরকে বিচলিত করে তুলতো। বাগানে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতো যখন মনিরা তখন দূর থেকে লক্ষ্য করতো বনহুর, হাসতো মনে মনে—স্বামীর সঙ্গে ছলনার এবার হচ্ছে সাজা।

মনিরা হয়তো সারাদিন শয্যায় শুয়ে চিন্তা করতো। পাশে বসে বোঝাতো মাসুমা, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতো অনেক। এমন কি হাশেম চৌধুরী পর্যন্ত নানাভাবে মনিরাকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করতেন।

শিখ ড্রাইভারের বেশে বনহুর সব দেখতো, সব শুনতো। কতদিন হাশেম চৌধুরী শিখ ড্রাইভার শিবাজীকে নিয়ে বের হতেন, এখানে-সেখানে সন্ধান করে ফিরতেন রঞ্জন বাবুর। এ-পথ সে-পথ চষে ফিরতেন হাশেম চৌধুরী।

বলতো শিবাজী—হুজুর আপ্ কিস্‌কে লিয়ে দিন তামাম্ ঘুম্‌তে?

বলতেন হাশেম চৌধুরী—এক আদ্‌মীকে লিয়ে হাম্ বাহুৎ পেরেশান হুয়ে। উছিকে লিয়ে এত্‌না রাহা ঘুম্‌তে শিবাজী।

হাশেম চৌধুরীর কথায় হাসতো শিবাজী—হুজুর আদমীতো জানোয়ার নেহি। যো রাহা পর ঢুরনেছে ফায়দা হুয়ে।

এমনি কতদিন হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন হাশেম চৌধুরী।

স্বামী ফিরে আসতেই মাসুমা ছুটে এসেছে গাড়ির পাশে, ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে—পেলে তাকে?

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলেছেন হাশেম চৌধুরী—কই আর পেলাম! হতাশ ভরা কণ্ঠস্বর তাঁর।

গাড়ির দরজা ধরে তখন দাঁড়িয়ে শিখ ড্রাইভার শিবাজী। ভিতরে ভিতরে হাসে সে। যার সন্ধানে তোমরা ঘাবড়ে মরছো সে যে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

একদিন হাশেম চৌধুরী পুলিশ ভ্যান নিয়ে কোনো ডাকাতি কেসের তদারক করতে গেছেন।

মাসুমার শরীর আজ ভাল নেই।

মনিরা বললো—মাসু, আমি একটু বাইরে যাবো।

তা কি করে হয়, একা যাবি? আমার যে অসুখ।

তা হোক তোদের ড্রাইভারকে বলে দে একটু নিয়ে যেতে।

বুঝেছি, নিজে খোঁজ করতে যাবি—এই তো?

যা বলবি তাই।

মাসুমা কলিং বেলে চাপ দেয়।

বয় কক্ষে প্রবেশ করে—মা-জী।

এই শোন্ ড্রাইভারকে একবার ডেকে দে দেখি।

আচ্ছা মা-জী। বেরিয়ে যায় বয়।

একটু পরে শিখ ড্রাইভার শিবাজীসহ বয় ফিরে আসে।

শিবাজী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলুট ঠুকে বলে—বিবিজী আপ্ হাম্‌কো বোলাতে?

হাঁ শিবাজী, আমার বান্ধবী বাইরে যাবেন। গাড়ি বের করে নাও। আর শোন, সাবধানে নিয়ে যেও।

বহুৎ আচ্ছা বিবিজী। সেলুট করে চলে গেলো শিবাজী।

মনিরা তৈরি হয়ে ফিরে এলো মাসুমার পাশে।

মাসুমা বললো—একি, আজও ঐ বোরখা পরেছিস্? এখন কার কাছে আত্মগোপন বলতো?

অভ্যাস হয়ে গেছে, আর যে ভাল লাগে না।

চল্ তোকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি না যে অসুখ শরীরে তাই বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হবে। চুপ করে শুয়ে থাক দিকি।

শীগ্গীর ফিরে আসবি কিন্তু।

আচ্ছা।

মনিরা বোরখা আচ্ছাদিত শরীর নিয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো।

শিখ্ ড্রাইভার দরজা খুলে ধরলো।

পিছন আসনে উঠে বসলো মনিরা।

ড্রাইভিং আসনে বস্লো শিখ ড্রাইভারবেশী বনহুর নিজে। তার ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠেছে। এমনি এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো সে।

গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার পূর্বে বললো বনহুর—আপ্ কাঁহা যাওগি?

বেলুচা বাজার।

হাসলো বনহুর মনে মনে, বেলুচা বাজার দিল্লীর সবচেয়ে বড় ফুলের বাজার। এখানে কেন যাবে মনিরা—ফুলের বাজারে যদি তার স্বামীকে খুঁজে পায় সেই আশায় কি?

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

ড্রাইভ আসনে বনহুর। আর পিছন আসনে মনিরা।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে গাড়ি ছুটে চলেছে।

বেলুচা বাজারের পথ চিনতো মনিরা, মাসুমা আর হাশেম চৌধুরীর সঙ্গে আরও কয়েকবার এসেছিলো সে। আজ তো এটা সে-পথ নয়। মনিরা একটু চিন্তিত হলো ড্রাইভারের ভাবগতিক ভাল বলে মনে হচ্ছে না তার। হঠাৎ বলে উঠলো সে—এ কোন্ পথে আমাকে নিয়ে যাচ্ছো?

বললো শিবাজী—চুপচাপ্ আপ্ বয়ঠিয়ে বিবিসাব।

অগত্যা মনিরা বসেই রইলো, মনে করলো এটা হয়তো অন্য কোনো পথ ধরে তাকে বেলুচা বাজার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মনিরা বুঝতে পারে তার সন্দেহ সত্য। ড্রাইভার তার গাড়িখানা নিয়ে নির্জন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। এ পথ বেলুচা বাজার যাবার পথ নয়।

মনিরা এবার ভীত আশঙ্কিত হয়ে পড়লো। এ যে মেঠো অসমতল পথ বেয়ে তার গাড়ি চলেছে। নিশ্চয়ই ড্রাইভারের মনে কোনো কুমতলব আছে।

মনিরার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। দুরু দুরু বক্ষে কম্পিত কণ্ঠে বললো—এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো ড্রাইভার?

আপ্ চুপ্ সে বইঠিয়ে বিবিসাব।

মনিরার সমস্ত শরীর ঘেমে চুপসে উঠতে লাগলো—হায়, একি হলো! কেন সে ড্রাইভারকে বিশ্বাস করেছিলো—এখন উপায়? গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বে কি? তাই ভাল—মৃত্যু হয় সেও ভাল তবু ইজ্জৎ হারাবে না।

মনিরা গাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে সরে বসলো।

শিবাজী তার সম্মুখের আয়নায় সব লক্ষ্য করছিলো, বললো কই চালাকি মত করিয়ে! গাড়িছে গিরনেছে খতম হো জায়েগি বিবিসাব।

না আমি যাবো না, আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। বাসায় নিয়ে চলো বলছি।

গাড়ির স্পীড তখন অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ভীষণ ঝাকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি তীরবেগে ছুটে চলেছে।

মনিরা বোরখা-পরা অবস্থায় থরথর করে কাঁপছে, শেষ অবধি তার পরিণতি এই ছিলো। তবুও সাহস করে বললো মনিরা—ড্রাইভার পুলিশ সুপার জানতে পারলে তোমার কি অবস্থা হবে জানো?

কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো ড্রাইভার...হাঃ হাঃ হাঃ

গাড়ির ঝাকুনির সঙ্গে সে হাসি যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লো গাড়ির মধ্যে।

মনিরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো। কিন্তু তার পূর্বেই শিবাজী বুঝতে পারলো তার মনোভাব। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর মনিরাকে পিছন আসন থেকে টেনে নামিয়ে ড্রাইভিং আসনের পাশে বসিয়ে নিলো জোর করে। বামহস্তে মনিরাকে চেপে ধরে রাখলো আর দক্ষিণ হস্তে সে গাড়ি চালিয়ে চললো।

শিবাজীর বামহস্তে চাপেই মনিরা একটুও নড়তে পারলো না। চিৎকার করে কোনো লাভ নেই, কারণ আশেপাশে কোনো লোকজন বা বাড়িঘর নেই যে তাকে উদ্ধার করবে।

একটা পোড়াবাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামিয়ে ফেললো শিবাজী। মনিরার মুখমণ্ডল এখনও বোরখায় ঢাকা রয়েছে। সে বোরখার মধ্য হতেই তাকিয়ে দেখলো—বাড়ির আশেপাশে একটি জন-প্রাণী নেই। অসহায় কণ্ঠে বললো

মনিরা—তুমি যা চাও তাই দেবো, আমাকে বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে এসো ড্রাইভার। যত টাকা চাও তাই পাবে।

ডাইভার কোনো কথা না বলে মনিরাকে টেনে-হিঁচড়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে চললো। সিংহদ্বার পেরিয়ে পর পর আরও কত গেট পার করে নিয়ে এলো অন্দর মহলের একটি কক্ষে।

মনিরার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে, সমস্ত মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। করুণ কণ্ঠে বললো মনিরা—এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

মেরা ঘর!

আমাকে এখানে কেন তুমি নিয়ে এলে?

হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ—কেন নিয়ে এলাম জানতে চাও? হাঃ হাঃ হাঃ...

সে হাসির শব্দে সমস্ত বাড়িখানা যেন দুলে দুলে উঠে।

অবাক হয়ে তাকায় মনিরা, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে—তুমি—তুমি.......

হাঁ, আমিই দস্যু বনহুর। আলেয়া, আজ তোমাকে আমি আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছি। কেউ তোমাকে আমার কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না।

পরবর্তী বই

সাপুড়ে সরদার

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই